جسور المحبة ـ بنغالي

ভালবাসার সেতুসমূহ

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

144

هاتف: ٠١٦ ٤٢٣٤٤٦٦ ـ فاكس: ٠١٦ ٤٢٣٤٤٧٧

تعاوني الزلفي

جسور المحبة

تأليف الشيخ د: عائض بن عبد الله القرني

ترجمه للغة البنغالية:

شعبة توعية الجاليات في الزلفي

الطبعة الأولى: ١٤٢٧/٥ هـ.

ⓒ شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

جسور المحبة- بنغالي/ د:عائض القرني

٨٢ ص؛ × ١٧ سم

ردمك :x-٣-٨٦-٨٦٤-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-الآداب الإسلامية٢- الفضائل أ. العنوان

ديوي ٢٥٩ ١٤٢٤/٢٢٨

رقم الإيداع : ١٤٢٦/٥٢٠٦

ردمك : x-٣ - ٨٦-٨٦٤-٩٩٦٠

الصف والإخراج: شعبة توعية الجاليات في الزلفي

পৃষ্ঠা	বিষয়
৪	ভূমিকা
৭	প্রথমতঃ ইসলামের সম্ভাষণ
১০	কাকে সালাম সালাম করবো
১৭	মহিলাদের সালাম করা
১৮	সালামের আদব
২৫	মজলিসে সালাম করার আদব
২৮	পরিবারকে সালাম দেওয়ার আদব
২৮	ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সালাম দেওয়ার আদব
৩১	দ্বিতীয়তঃ দাওয়াত কবুল করা
৩২	দাওয়াতের আদব
৩৫	তৃতীয়তঃ দ্বীনের মূল শিক্ষাই হলো নসীহত করা
৩৮	নসীহত করার আদব
৩৮	চতুর্থতঃ হাঁচির উত্তর দেওয়া
৩৮	হাঁচির উত্তর কখন দেবে এবং তার আদব
৪১	দু'টি দুর্বল হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত
৪৪	পঞ্চমতঃ রোগীকে দেখতে যাওয়া
৪৪	রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফযীলত
৪৬	রোগীকে দেখতে যাওয়ার কিছু আদব
৪৯	ষষ্ঠতঃ জানাযায় শরীক হওয়া
৪৯	জানাযায় শরীক হওয়ার ফযীলত
৫২	হৃদয় আকৃষ্ট করার কৌশল
৫২	প্রথমতঃ সাহাবীদের পেশকৃত উন্নত নমুনা
৬৯	দ্বিতীয়তঃ পারস্পরিক বিরোধ দূর করার পদ্ধতি
৭৯	তৃতীয়তঃ ইসলামী পতাকা তলে একত্রিত হওয়া

جسور المحبة

ভালবাসার সেতুসমূহ

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا))

আল্লাহর নিমিত্ত ভালবাসা হলো ঈমানের মহান হাতল ও উহার ভিত্তিসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। ভালবাসার রয়েছে অনেক সেতু যা আমাদের বরকতময় ও মহান প্রতিপালক মু'মিনদের মাঝে স্থাপন করেছেন। এর মাধ্যমে তাদের পরস্পরের অন্তরকে জুড়ে দিয়েছেন। ভালবাসার এই সেতুসমূহকে মহান আল্লাহ তাঁর মহা গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। কোথাও বলেছেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾. [الحجرات:١٠].

অর্থাৎ, "মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই।" (সূরা হুজরাতঃ ১০) মহান আল্লাহ কোথাও বলেছেন,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾. [آل عمران:١٠٣].

অর্থাৎ, "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে-ইমরানঃ ১০৩)

আবার বরকতময় নামের অধিকারী কোথাও বলেছেন,

﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. [الأنفال:٦٣].

অর্থাৎ, "(আল্লাহই) প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু রয়েছে যমীনের বুকে, তবুও তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।" (সূরা আনফালঃ ৬৩) পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ ভালবাসাকে মু'মিনদের পরস্পরের মধ্যে সীমিত ঘোষণা ক'রে বলেন,

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾. [التوبة:٧١].

অর্থাৎ, "আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু।" (সূরা তাওবাঃ ৭১) আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُونَ ﴾. [المائدة:٥٥-٥٦].

অর্থাৎ, "তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।" (সূরা মায়েদাঃ ৫৫-৫৬) রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)ও ভালবাসার সেতুর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনিই এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ইহা মজবুত করেছেন এবং ভালবাসার রজ্জুসমূহকে স্বীয় অনুসারীদের অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: قِيْلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ))

অর্থাৎ, "মুসলিমদের পারস্পরিক ছয়টি অধিকার রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! অধিকারগুলো কি কি? তিনি বললেন, যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তাকে সালাম করবে। যখন তোমাকে দাওয়াত করবে, তখন তা গ্রহণ করবে। যখন সে তোমার কাছে উপদেশ চাইবে, তখন তাকে সদুপদেশ দেবে। যখন সে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলবে, তখন তাকে উদ্দেশ্য ক'রে 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলবে। যখন সে অসুস্থ হবে, তখন তাকে দেখতে যাবে এবং যখন সে মারা যাবে, তখন তার জানাযায় শরীক হবে।" (মুসলিম ২১৬২)

* এগুলো হলো নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ। এমন কোন দিন বা রাত অতিবাহিত হয় না যে দিনে বা রাতে এই বিষয়গুলোর কোন একটি সংঘটিত হয় না। তা সত্ত্বেও অনেকে তার মুসলিম ভাইয়ের এই অধিকারগুলো আদায়ের ব্যাপারে গড়িমসি করে। তাই, না কোন অসুস্থকে দেখতে যেতে দেখা যায়, না কারো জানাযায় শরীক

হয়, আর না কাউকে সালাম করে। যখন দেখলাম (পারস্পরিক অধিকার আদায় না করার) ব্যাপারটা একেবারে পরিষ্কার, তখন আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা ক'রে এই কিতাবের বিষয়গুলো একত্রিত করার কাজে লেগে গেলাম। এতে ভালবাসার কিছু সেতুর কথা উল্লেখ করেছি। প্রথমতঃ নিজের স্মরণার্থে, অতঃপর আপন ভাইদেরকে ভালবাসার এই সেতুসমূহকে নিজেদের মধ্যে বিস্তৃত করার প্রতি অনুপ্রাণিত করার জন্য। যাতে করে মুসলিমদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সম্প্রসারিত হয়। আসুন, আমরা একে অপরকে ভালবাসি, প্রীতি সঞ্চার করি এবং একে অপরের প্রতি সদয় হই।

প্রথমতঃ ইসলামের সম্ভাষণঃ

১। সালাম করাঃ সালাম করা হলো ইসলামের সম্ভাষণ। যে মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ করে তার করণীয় সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ)) رواه أبوداود ٥٢٠٠

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ যখন তার অপর কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন সে যেন তাকে সালাম করে।" (আবু দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবু দাউদ আলবানী ৫২০০) কাজেই সালাম হলো এমন সম্ভাষণ যা আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর জান্নাতীদেরও অভিবাদন হবে এটাই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ﴾. [الأحزاب:٤٤].

অর্থাৎ, "যেদিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম।" (সূরা আহযাবঃ ৪৪) আর এটা এমন সম্ভাষণ যা আল্লাহর পছন্দ এবং তাঁর রাসূলও স্বীয় অনুসারীগণ ও উম্মতদের জন্য তা পছন্দ করেছেন। তাই কোন মুসলিমের জন্য ইসলামের এই সম্ভাষণকে অন্য জাতিদের সম্ভাষণ দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েয নয়। ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমরা জাহেলিয়াতের যুগে (ইসলাম আসার পূর্বে) বলতাম, আল্লাহ তোমার চক্ষুকে সুশীতল রাখুন! তোমার প্রভাত সুন্দর হোক! কিন্তু ইসলাম আসার পর আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হয়। (আবু দাউদ ৫২২৭, ইবনে হাজার বলেছেন, হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য তবে উহার সানাদ সূত্রে বিচ্ছেদ ঘটেছে। ফাতহুল বারী ১১/৬) (আল্লামা আলবানী বলেন, হাদীসটি যঈফ দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবু দাউদ ৫২২৭) ইবনে আবু হাতেম মুক্বাতিল ইবনে হাইয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে মানুষেরা বলাবলি করতো, শুভ সন্ধ্যা! সুপ্রভাত! অতঃপর আল্লাহ এটাকে সালাম শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। (ফাতহুল বারী ১১/৬) অতএব অত্যাবশ্যক হলো, প্রত্যেক মুসলিম আরম্ভ করবে এই মহান সম্ভাষণ তথা শরীয়তী এই সালাম দিয়ে যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুন্নত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾. [النساء:٨٦].

অর্থাৎ, "আর যখন তোমরা শুভাশিষে সম্ভাষিত (সালাম ও

অভিবাদন) হও, তখন তোমরাও তার চেয়ে উত্তম শুভ সম্ভাষণ করো অথবা ওটাই ফিরিয়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী।" (সূরাঃ ৮৬) 'তার চেয়ে উত্তম' বলতে সে সম্ভাষণে যতটা বলেছে, তুমি তার চেয়ে বেশী বলবে। অর্থাৎ সে যদি বলে, 'আস্সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লাহ' তাহলে তুমি বলবে, 'অ আলাইকুমুস্সালাম অ রাহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু' অথবা সে যতটা বলেছে, তুমিও ততটা বলবে। অর্থাৎ বলবে, 'অ আলাইকুমুস্সালাম অ রাহমাতুল্লাহ'। আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে সহীহ সানাদে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, 'আস্সালামু আলাইকুম' তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন। অতঃপর সে বসলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, "দশটি" (অর্থাৎ, সে দশটি নেকী পেল।) তারপর আর একজন এসে বললো, 'আস্সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লা-হ' তারও উত্তর দিলেন। সে বসলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, "বিশ"। (অর্থাৎ, সে বিশটি নেকী পেল।) অতঃপর আরো একজন এসে বললো, 'আস্সালামু আলাই-কুম অ রাহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু' তিনি এরও উত্তর দিলেন। তারপর যখন সে বসলো, বললেন, "ত্রিশ"। অর্থাৎ, সে ত্রিশটি নেকী পেল যে পূর্ণ সম্ভাষণ পেশ করলো। (আবু দাউদ ৫১৯৫-তিরমিযী ২৬৮৯ হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৫১৯৫-২৬৮৯)

এই হলো নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর শিক্ষা

এবং স্বীয় সাহাবাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার এই হলো তাঁর তরীকা-পদ্ধতি। লক্ষ্য করুন! মহা প্রতিদান সম্পর্কে অবহিত করিয়ে কিভাবে স্বীয় সাহাবীদের অন্তরে সুন্নতের প্রতি ভালবাসার জন্ম দিচ্ছেন। এক ও একক আল্লাহ্ কর্তৃক এ প্রতিদান তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে, যদি তাঁরা তাঁর (রাসূলের) শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করেন এবং তাঁর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

২। কাকে সালাম করবো?

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযী আল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলা-ইহি অসাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করলো, ইসলামের কোন্ কাজটি সব চেয়ে উত্তম? তিনি বললেন,

((تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ)) رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ, "অভুক্তদের আহার করানো এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম করা।" (বুখারী ১২-মুসলিম ৩৯) এটাও ইসলামে নবীর মহান শিক্ষা। তুমি পরিচিত ও অপরিচিত সকল মুসলিমকে সালাম করবে। সালফে-সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন, পরবর্তী-কালের লোকদের নিকট সালাম কেবল পরিচিতি সাপেক্ষ হয়ে গেছে। আর এটা হলো কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন। কাজেই মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো, আহলে কিতাব, মুশরিক এবং মূর্তিপূজকদের ব্যতীত পরিচিত ও অপরিচিত সকল মুসলিমের মাঝে সালামের প্রচলন সৃষ্টি করা। মুসলিমই হলো এই হাদীসের

লক্ষ্য। অনুরূপ অন্য যেসব হাদীসে মানুষের একে অপরের অধিকারের কথা বলা হয়েছে তারও লক্ষ্য হলো মুসলিম। তাই মুসলিম সমাজে বসবাসকারী মানুষের নিকট দাবী হলো, সে যারই সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে সালাম করবে। চাই সে তার পরিচিত বন্ধু হোক অথবা অপনজন কেউ হোক বা অপরিচিত কেউ হোক।

সামাজিক ভুলের মধ্যে হলো, আমরা বর্তমানে কেবল পরিচিতি ভিত্তিক সালাম করি। রাস্তা-ঘাটে মানুষদেরকে দেখবে তারা কেবল তাদেরকেই সালাম করছে যাদেরকে তারা চেনে। কিন্তু যাদেরকে চেনেনা তাদেরকে সালাম করে না। আর এটা হলো জাহেলিয়াতের কার্যকলাপ এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সুন্নত পরিপন্থী। কেননা বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে যে, মহান আল্লাহ আদম (আঃ)কে সৃষ্টি ক'রে বললেন,

((اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوْا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فزادوا: وَرَحْمَةُ اللهِ)) رواه البخاري ٦٢٢٧ومسلم ٢٨٤١

অর্থাৎ, "ওখানে বসা ফেরেশতাদের সালাম করো এবং শোন তাঁরা তোমাকে কি উত্তর দেন। কারণ এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের (পারস্পরিক) সালাম। তিনি (আদম আলাইহিস্‌সালাম) সেখানে গিয়ে বললেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লা-হ' তাঁরা 'রাহমা তুল্লা-হ' শব্দের বৃদ্ধি করলেন।" (বুখারী ৬২২৭-মুসলিম ২৮৪১)

এই হলো আদম (আঃ), তাঁর বংশধর এবং জান্নাতবাসীদের সম্ভাষণ। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ)) رواه مسلم ٥٤

অর্থাৎ, "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান এনেছো। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অপরকে ভালবাসতে পেরেছো। আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দিবো না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হবে? (কাজটি হলো,) তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপকহারে সালামের প্রচলন করো।" (মুসলিম ৫৪) এই হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পরিষ্কার করে বলে দিলেন যে, ঈমান ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। আর প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা ছাড়া ঈমান লাভ করা যাবে না এবং ব্যাপকহারে সালামের প্রচলন করা ব্যতীত ভালবাসার জন্ম হবে না।

ব্যাপকহারে সালামের প্রচলন অন্তর থেকে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষকে দূর করে, বিশেষ করে নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অন্তর থেকে। ইসলামে এর অর্থ হলো, তুমি তোমার শান্তিসূচক সাদা ঝান্ডা উত্তোলন ক'রে নিরাপত্তার পায়গাম দিচ্ছো। অর্থাৎ, তুমি বলছো, আমি সাদা ঝান্ডা উত্তোলন করেছি অতএব আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা গ্রহণ করো এবং আমার থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই।

আর এটাই হলো প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার প্রতীক, যার ভিত্তি স্থাপন করেছেন আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এবং স্বীয় সাহাবীগণ ও পরে আগত উম্মতের অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করণের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন। ইমাম বুখারী আ'ম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) থেকে মাওকুফ সানাদ-সূত্রে বর্ণনা করেছন, তিনি (আ'ম্মার রাঃ) বলেন, 'তিনটি গুণ যে নিজের মধ্যে একত্রিত করে নিয়েছে, সে পূর্ণ ঈমান একত্রিত করে নিয়েছে। তোমার নিজের ব্যাপারে ইনসাফ করা, সকলকে ব্যাপকভাবে সালাম করা এবং অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দান করা।' এখানে 'সকলকে সালাম করা' কথার দ্বারা বান্দার বিনম্র হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সে কারো প্রতি অহংকার প্রদর্শন করবে না, বরং সে ছোট-বড়, উচ্চমানের ও নিম্নমানের এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম করবে। আর অহংকারী এর বিপরীত। সে তো অহংকার ও আত্মম্ভরিতার বশীভূত হয়ে সকলের সালামের উত্তরও দেয় না। তাহলে সকলকে সালাম সে কেমনে করবে? বুখারী ও মুসলিম শরীফে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাহু আলাইহি অসাল্লাম) ছোট শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম করেন।" (বুখারী ৬২৪৭-মুসলিম ২১৬৮) আর এটা এই জন্য যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ছিলেন অতীব বিনম্র, নরম এবং করুণাসিক্ত। আর এর মাধ্যমে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এই শিশুদের অন্তরে চরম আনন্দ প্রবেশ করান। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর এদেরকে সালাম করায় তারা নিজেরা বড় গর্ববোধ করবে এবং বিভিন্ন মজলিসে

তা বলাবলিও করবে।

মুসলিমের উচিত হলো, এই রকম শিশুদের জন্য বিনম্র হওয়া এবং ছোট মনে করে তাদেরকে অবজ্ঞা না করা। বরং তাদেরকে খুঁজে খুঁজে সালাম করবে। কেননা এই সালাম তাদেরকে ভালবাসার শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে উত্তম চরিত্র গঠনের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে। উমার (রাঃ)-এর জীবনে আমরা লক্ষ্য করি যে, তাঁর অসামান্য গাম্ভীর্য এবং হক্কের ব্যাপারে অতীব কঠোর হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সালাম করতেন এবং তাদের সাথে রহস্য করতেন, অথচ তিনি হচ্ছেন সমগ্র মুসলিমদের খলীফা। একদা মদীনায় শিশুদের পাশ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন তারা খেলা করছিলো। যখন তারা তাঁকে দেখেন এবং তাঁর আগমনের গম্ভীর শব্দ, বিভব ও প্রতিপত্তির কথা শুনে সকলে নিজের নিজের ঘরের দিকে দৌড় দেন। শয়তান তো উমার (রাঃ)কে দেখে পালায়, তাহলে শিশুরা কেন পালাবে না? যে শিশুদের অন্তর হলো পাখির অন্তরের মত তারা এমন মানুষ দেখে কেন পালাবে না যিনি রোম সম্রাটদের নিরাশ করে ছেড়ে ছিলেন এবং যার কারণে পারস্যের রাজারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলো। সবাই পালিয়ে গেলো কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের পালালেন না। তিনি ছিলেন তরুণ। উমার (রাঃ) তাঁকে ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথীরা সকলে পালিয়ে গেলো তুমি পালালে না কেন? উত্তরে আব্দুল্লাহ বললেন, আমি কোন অন্যায় করি নি যে আপনাকে ভয় করবো এবং রাস্তাও সংকীর্ণ নয় যে আপনার জন্য তা প্রশস্ত করে দিবো। এই থেকে তাঁর

বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর তিনি তো বুদ্ধিমান হবেনই তাঁর পিতা হচ্ছেন যুবায়ের ইবনে আউওয়াম এবং মাতা হচ্ছেন আসমা-আল্লাহ এঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন!-। "যারা বংশধর ছিলেন পরস্পরের। আল্লাহ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী" (আল-ইমরানঃ৩৪)

৩। সালামের আমানত বহন করা ও উহার প্রচার করাঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যার সামনাসামনি হতেন তাকে তিনি আগেই সালাম করতেন। আর অনুপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাকে তিনি সালাম দেওয়ার ইচ্ছা করতেন তার নিকট সালাম (অন্যের মাধ্যমে) পৌঁছে দিতেন। যেমন (একদা) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এক যুবককে এক অসুস্থ ব্যক্তির নিকট পাঠালেন। সে তার কাছে এসে বললো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আপনাকে সালাম দিয়েছেন। (মুসলিম ১৮৯৪) অনুরূপ তিনি নিজেও সালাম বহন ক'রে তার প্রাপকের নিকট পৌঁছে দিতেন। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে যে, জিব্রাইল (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করেন। তখন খাদীজা (রাযীআল্লাহু আনহা) আসছিলেন। তিনি (জিব্রাইল আঃ তাঁকে আসতে দেখে) বলেন,

((يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِهِ خَدِيْجَةُ أَتَتْكَ بِالطَّعَامِ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ)) البخاري ٧٤٩٧ومسلم ٢٤٣٢

অর্থাৎ, "হে আল্লাহর রাসূল! খাদীজা (রাযীআল্লাহু আনহা) আপনার নিকট খাবার নিয়ে আসছেন। তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের

পক্ষ থেকে সালাম দিবেন এবং তাঁকে জান্নাতে একটি মুক্তার তৈরী ঘরের সুসংবাদ দিবেন যেখানে না থাকবে কোন হট্টগোল-চিৎকার আর না কোন ক্লান্তি।" (বুখারী ৭৪৯৭-মুসলিম ২৪৩২) অনুরূপ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) কে জিব্রাইলের সালাম পৌঁছে দিয়েছিলেন। (বুখারী-মুসলিম) সঠিক উক্তি অনুযায়ী সালামের শেষ শব্দ হলো 'অ বারাকাতুহু' পর্যন্ত। এটা আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বলিষ্ঠ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ 'অ মাগফিরাতুহু' শব্দ বর্ধিত করেছেন। কিন্তু এই বর্ধন দুর্বল। ইমাম আবু দাউদ এটা এমন এক হাদীসে উল্লেখ করেছেন যা প্রমাণিত নয়। (আবু দাউদ ৫১৯৬, ইবনুল কাইয়ূম এই হাদীসের তিনটি দোষ বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্যঃ যাদুল মাআ'দ ২/৪১৭ ইবনে হাজারও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ফাতহুল বারী ১১/৮)

বুখারী, তিরমিযী ও মুস্তাদরাকুল হাকিমে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন সালাম করতেন, তখন তিনবার সালাম করতেন। (বুখারী ৯৪-তিরমিযী ২৭২৩) সম্ভবতঃ যখন তিনি অনেক সংখ্যক মানুষকে সালাম করতেন একবার সালাম যাদের সকলের নিকট পৌঁছবে না এবং ধারণা করতেন যে, প্রথম সালাম (সবাই) শুনতে পায় নি, তখন এই নিয়মে সালাম করতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)-এর যিয়ারত করার জন্য যান। তাঁর দরজায় এসে বললেন, 'আস্সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু' সা'দ (রাঃ) তা শুনে ধীরে কোন শব্দ না ক'রে তার উত্তর দিলেন। ফলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লাম) আবার বললেন, 'আস্সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু' সা'দও আস্তে ক'রে উত্তর দিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে শুনালেন না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আবারও বললেন, 'আস্সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু' সা'দও আস্তে ক'রে উত্তর দিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে শুনালেন না। ফলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন ফিরে যেতে লাগলেন, সা'দ (রাঃ) তখন তাঁর সাথে মিলিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সব সালামই শুনেছি এবং আসতে ক'রে উহার উত্তরও দিয়েছি। তবে আমি চাইলাম আমাদের উপর আপনার সালাম আরো বেশী হোক। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, 'আস্সালামু আলাইকুম আহলাল বায়ত অ রাহমাতুহু ইন্নাহু হামীদুম মাজীদ'। হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর আদাবুল মুফরাদ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন ১০৭৩, 'যাদুল মাআ'দ' কিতাবের মুহাক্কীক্ব (গবেষক) বলেন, এই হাদীসের সানাদে দুর্বলতা রয়েছে। (তবে মূল ঘটনা সহীহ। কেবল শেষের দুআটি দুর্বল।)

মহিলাদের সালাম করাঃ

তিরমিযী ২৬৯৭, আবু দাউদ ৫২০৪ এবং ইবনে মাজা ৩৭০১ ও আদাবুল মুফরাদ ১০৪৭ নামক হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) একদা একদল মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে হাতের ইঙ্গিতে সালাম করলেন। (হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী, আবু দাউদ ও

ইবনে মাজা আলবানীঃ ২৬৯৭- ৫২০৪-৩৭০১) একদল মহিলা পথের ধারে ছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'আস্সা-লামু আলাইকুন্না অ রাহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু' এই ছিলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর চরিত্র। কারণ, তিনি নারী-পুরুষ সকলেরই রাসূল।

কোন কোন আলেম বলেছেন, কোন প্রতিবন্ধকতা যদি না থাকে এবং ফিৎনারও যদি কোন আশঙ্কা না থাকে, তাহলে মহিলাদের সালাম করা জায়েয। যেমন, বৃদ্ধা মহিলা। আপনি তাকে সালাম করতে পারবেন এবং তার সাথে আলাপ ক'রে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। যেমন সাহাবাগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন!) করতেন। বুখারী শরীফে সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা (সাহাবাগণ) জুমআর নামায পড়ে তাঁদের যাওয়ার পথে এক বৃদ্ধা মহিলার নিকট এসে তাকে সালাম করতেন। (বুখারী ৬২৪৮) বার্ধক্যের চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন এমন মুসলিম বৃদ্ধাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ক'রে এ কাজ (সালাম) করার প্রতি তো অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। ইসলাম বহু হাদীসে এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমও এই মতের পক্ষে গেছেন। (যাদুল মাআ'দ ২/৪১২)

সালামের আদবঃ

১। বুখারী (৬২৩১) ও মুসলিম শরীফে (২১৬০) বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالرَّاكِبُ عَلَى

الْمَاشِي، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ)).

অর্থাৎ, "ছোট সালাম করবে বড়কে। আগমনকারী সালাম করবে যে বসে আছে তাকে। বাহনে আরোহণকারী সালাম করবে পদব্রজের যাত্রীকে এবং কমসংখ্যক লোকেরা সালাম করবে বেশী সংখ্যক লোকদেরকে।"

***ছোট সালাম করবে বড়কেঃ** এখানে কৌশলগত দিক হলো, বড়োর রয়েছে সম্মান পাওয়ার অধিকার। তাই ছোট প্রথমে বড়কে সালাম করবে। কাজেই তুমি যখন এমন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করবে যে তোমার থেকে বয়সে বড়, তখন তাকে আগে বেড়ে সালাম করা তোমার উপর জরুরী হবে। যাতে তুমি তাকে এই ধারণা দিতে পারো যে, তুমি তার সম্মান করলে এবং তার বয়সের মর্যাদা দান করলে। আর সে যদি তোমাকে আগে সালাম করে, তাহলে সে তোমার থেকে উত্তম হলো এতে কোন সন্দেহ নেই। মোট কথা যে বয়সে ছোট, সে সালাম করবে তাকে যে বয়সে বড়। আর এরই উপর অনুমান করা হবে আলেম সমাজকে, বড় সম্মানিত শায়খকে, মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এবং যার রয়েছে ইসলামে উত্তম পুরস্কার অথবা যথার্থ সম্মান। এদের সকলকে আগে সালাম করবে।

***'আগমনকারী সালাম করবে তাকে যে বসে আছে'ঃ** রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর এই উক্তি, অনুযায়ী আগমনকারীর কর্তব্য হলো, সে তাকে আগে সালাম করবে, যে বসে আছে। ওদের মত করবে না যারা সব সময় ও সর্বাস্থায় অপেক্ষায় থাকে যে, তাদেরকে আগে সালাম করা হোক। তাতে তারা বাহনে আরোহ-ণকারী হোক অথবা আগমনকারী হোক বা বসে আছে এমন লোক

হোক। অথচ এটা ভুল। এই প্রকৃতির মানুষের অহংকারী বিবেচিত হওয়ার আশংকা আছে। অতএব এ ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত সুন্নতী তরীকা কি তা জানা এবং উহার যত্ন নেওয়া অত্যাবশ্যক। কাজেই আগমনকারী তাকে আগে সালাম করবে, যে বসে আছে। কারণ সে সেখানে হঠাৎ করে এসেছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে একা হয়। পক্ষান্তরে যারা বসে থাকে, তারা সংখ্যায় বেশী হয়।

***'বাহনে আরোহণকারী সালাম করবে পদব্রজের যাত্রীকে'ঃ** রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর এই উক্তি অনুযায়ী বাহনে আরোহণকারী পদব্রজের যাত্রীকে আগে সালাম করবে। গাড়ির সাওয়ারী তাকে আগে সালাম করবে, যে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। কোন জীব-জন্তু ও এই ধরনের বাহনের উপরে আরোহণকারীর ব্যাপারও অনুরূপ। কোন কোন ভাষ্যকার -যেমন ফাতহুল বারীতে আছে-এর কিছু আকর্ষণীয় দৃষ্টিকোণেরও উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তাদের উক্তি হলো, বাহনে আরোহণকারী সব সময় আত্মগর্ব বোধ করবে। তাই নম্র ও বিনয়ী ভাব প্রকাশের জন্য ইসলাম তাকে বাধ্য করেছে যে, সে পদব্রজের যাত্রীকে আগে সালাম করবে। যাতে তার অহংকার তার বক্ষে অনুপ্রবেশ না করে।

'কমসংখ্যক মানুষ বেশী সংখ্যক মানুষকে সালাম করবে' রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর এই উক্তি অনুযায়ী কোন একজন মানুষ যখন একদল মানুষের পাশ দিয়ে যাবে, তখন সে তাদেরকে আগে সালাম করবে। এইভাবে পাঁচজন বিশিষ্ট দল দশজন বিশিষ্ট দলকে সালাম করবে। দশজন বিশিষ্ট দল পাঁচজন

বিশিষ্ট দলকে (আগে) সালাম করবে না। অনুরূপ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে,

((يُجْزِيءُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا: أَن يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِيءُ عَنِ الْجُلُوْسِ أَن يَرُدَّ أَحَدُهُمْ))

অর্থাৎ, "অতিক্রমকারী দলের পক্ষ থেকে কোন একজন সালাম করলে এবং বসে থাকা দলের পক্ষ হতে কোন একজন উত্তর দিলে, তা-ই যথেষ্ট হবে।" (হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবু দাউদ আলবানীঃ ৫২১০) তিরমিযী শরীফে এসেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ))

অর্থাৎ, "পথিক দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে সালাম করবে।" (হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ২৭০৫) এই হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত আদবসমূহ, তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর কৌশলগত দিক ও দৃষ্টিকোণ। কারণ, এমন কোন কল্যাণ নেই যা করার প্রতি তিনি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন নি এবং এমন কোন অকল্যাণ নেই যা থেকে তিনি আমাদেরকে সতর্ক করেন নি।

২। আগে সালাম করার ফযীলতঃ

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا

بَدَأَ فَهُوَ أَفْضَلُ))

অর্থাৎ, "বাহনে আরোহণকারী পদব্রজের যাত্রীকে সালাম করবে। পদব্রজের যাত্রী যে বসে আছে তাকে সালাম করবে। আর পদব্রজের উভয় যাত্রীর মধ্যে যে আগে সালাম করবে, সে-ই হবে উত্তম।" (আল-ইহসান ফী তাক্বরীবে সাহীহ ইবনে হিব্বান ৪৯৮, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সাহীহ ইবনে হিব্বান ৪৯৮) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) অন্যত্র বলেন,

((إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَن بَدَأَ بِالسَّلاَمِ))

অর্থাৎ, "মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর বেশী নিকটের যে আগে সালাম করে।" (আহমদ ও আবু দাউদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবু দাউদ আলবানীঃ ৫১৯৭) হাদীসের অর্থ হলো, মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর বেশী নিকটের এবং তাঁর বেশী প্রিয় বান্দা, যে মুসলিমদেরকে আগে সালাম করে। শ্রেষ্ঠতর সাহাবীগণ ও তাবেয়ীনদেরও এই অভ্যাস ছিলো যে তাঁরা অন্যদেরকে আগে সালাম করতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আরো বলেন,

((السَّلاَمُ قَبْلَ السُّؤَالِ، فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلاَمِ فَلاَ تُجِيْبُوْهُ))

অর্থাৎ, "প্রশ্ন করার পূর্বে সালাম করবে। কাজেই কেউ যদি আগে সালাম না করেই প্রশ্ন করতে শুরু করে, তাহলে তার উত্তর দেবে না।" (ইবনুস্‌সুন্নী রচিত আমালুল ইয়াওমি অল্লায়লা ২১৪, হাদীসটি হাসান/ভাল। দ্রষ্টব্যঃ সিলসিলাতুস্‌সাহীহাঃ ৮১৬) হাদীসের অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি আগে সালাম না করে কোন প্রশ্ন এবং কোন কথা

আরম্ভ করবে না। সালাম করে স্বীয় প্রশ্ন ও বিষয় আরম্ভ করবে। ইমাম তিরমিযী (২৭১০), ইমাম আবু দাউদ (৫১৭৬) এবং ইমাম আহমদ (৩/৪১৪) কালাদা ইবনে হাম্বাল থেকে সহী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, সাফওয়ান ইবনে উমায়্যা তাকে (কালাদা ইবনে হাম্বালকে) প্রসবের পর সর্ব প্রথম দোহন করা কিছু দুধ, হরিণের একটি ছোট বাচ্চা এবং কিছু কাঁকুড় দিয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তখন মক্কার উপত্যকার উপরি ভাগে অবস্থান করছিলেন। কালাদা ইবনে হাম্বাল বলেন, আমি সালাম না করে এবং অনুমতি না নিয়েই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তাই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, "ফিরে যাও, তারপর বলো, আস্সালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি?" (হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী ও আবু দাউদ আলবানীঃ ২৭১০-৫১৭৬)

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة:٢]

অর্থাৎ, "তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিলো ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" (সূরা জুমআঃ ২) নিরক্ষর এই উম্মতের মাঝে এই রাসূলকে পাঠালেন। যাতে তিনি তাদেরকে পবিত্র করেন, দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে উচ্চ

আদবসমূহ ও উন্নত নৈতিকতার শিক্ষা দেন। কালাদা বর্ণিত হাদীসের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে, প্রবেশ করার পূর্বে এবং কথা ও সব কিছুর পূর্বে সালাম দিতে হবে। আবু দাউদ শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন কারো ঘরের দরজায় আসতেন, তখন সরাসরি দরজাকে সম্মুখ ক'রে দাঁড়াতেন না। বরং দরজার ডান অথবা বাম কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম' আস্‌সালামু আলাইকুম' (হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবু দাউদ আলবানীঃ ৫১৮৬) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিয়ম ছিলো যে তিনি যার সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তাকে আগে বেড়ে সালাম করতেন এবং এর (আগে সালাম করার ব্যাপারে) তিনি বড়ই যত্ন নিতেন। তবে অহংকারীদের ব্যাপার এর বিপরীত। তারা সব সময় খোঁজে যে, মানুষ তাদেরকে আগে সালাম করুক।

সালাম শুরু হবে, 'আস্‌সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু' শব্দ দিয়ে। আর উত্তরদাতা 'অ আলাইকুমুস্‌সালাম' বলবে। অর্থাৎ, 'অ' অক্ষর বৃদ্ধি করবে। ইমাম নববী ও ইমাম ইবুনল কায়্যেম 'অ' অক্ষরকে সুসাব্যস্ত করেছেন। আর কেবল 'আলাইকুস্‌সালাম' বলা থেকে 'অ আলাইকুমুস্‌সালাম' বলা উত্তম ও সুন্দর। আর সালামদাতার 'আলাইকাস্‌সালাম' বলে সালাম দেওয়া অপছন্দনীয়। যেমন আবু জারী হুজাইমী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকটে এসে বললাম, 'আলাইকাস্‌সালাম ইয়া রাসূলুল্লাহ'। (তা শুনে) তিনি বললেন,

((لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى))

অর্থাৎ, "আলাইকাস্‌সালাম বলো না। কারণ, আলাইকাস্‌সালাম হলো মৃতদের সম্ভাষণ।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও আহমদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৫২০৯-২৭২২) এখন আমাদের কর্তব্য হলো, 'আলাইকাস্‌সালাম' বলে সালাম পেশ করা থেকে বিরত থাকা। কেননা, তারা এইভাবে মৃতদেরকে সালাম করতো। মৃতদের এই সম্ভাষণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পছন্দ করেন নি। আর পছন্দ না করার কারণে তিনি এইভাবে সালামদাতার উত্তরও দেন নি।

৩। মজলিসে সালাম করার আদবঃ

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ))

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ যখন মজলিসে আসবে, সে যেন সালাম করে। অতঃপর যখন উঠে যাবে, তখনও যেন সালাম করে। কারণ, দ্বিতীয় সালামের অধিকার প্রথমটির চেয়ে কম নয়।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ও আহমদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ৫২০৮-২৭০৬) হাদীসের অর্থ হলো, যখন আপনি আপনার ভাইদের ও সাথীদের থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন সেই স্থান ও মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে 'আস্‌-সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু' বলে তাদেরকে সালাম করবেন। এটা একটি সুন্নত অথচ অনেক মুসলিমই এই সুন্ন-

তের ব্যাপারে উদাসীন। এমন কি অনেককে 'ফী আমানিল্লা-হ' (আল্লাহর নিরাপত্তায়) ও 'আসতাওদিউকুমুল্লা-হ' (তোমাকে আল্লাহর হিফাযতে ছেড়ে দিলাম) বলতে দেখা যায়। আর মহান সুন্নতকে ছেড়ে দেয় যা হিদায়েতের পথ প্রদর্শক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত। আবু দাউদ শরীফে সহীহ সনদে বর্ণিত। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,।)

((إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضاً))

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ যখন তার অপর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন সে যেন তাকে সালাম করে। তারপর যদি তাদের দু'জনের মধ্যে কোন গাছ দেয়াল অথবা পাথরের অন্তরায় সৃষ্টি হয় এবং এরপর তারা আবার মুখোমুখী হয়, তাহলে যেন আবারও তাকে সালাম করে।" (হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৫২০০) সাহাবাগণের আমলের ব্যাপারে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ এক সঙ্গে পথ চলতেন। অতঃপর কোন গাছ অথবা উঁচু ঢিপি তাঁদের সামনে আসার কারণে তাঁরা ডানে-বামে ছড়িয়ে পড়তেন। তারপর আবার যখন মিলিত হতেন, তখন আবারও পরস্পরকে সালাম করতেন। (তাবরানী ৭/৩৭, আদাবুল মুফরাদ ১০১১, হাদীসের সনদ হাসান) এরই উপর অনুমান করা হবে মজলিসে প্রবেশকারী এবং মজলিস ত্যাগকারীকে। এটা একটি ভাল কাজ যার কর্তাকে নেকী দেওয়া হবে।

৪। মসজিদে প্রবেশের সময় সালামের আদবঃ

ইবুনল কায়্যেম (রাহঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর শিক্ষা হলো যে, মসজিদে প্রবেশকারী আগে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়বে। তারপর এসে (উপস্থিত) লোকদের সালাম করবে। (যাদুল মাআ'দঃ ২/৪১৩) তিনি (রাহঃ) নামাযে ত্রুটিকারী রেফাআ'র হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যে, তিনি (রেফাআ') আগে নামায পড়েন তারপর এসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-কে সালাম করলে তিনি সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, "যাও আবার নামায পড়ো, কারণ তোমার নামায হয় নি।" (বুখারী ৭৫৭-মুসলিম ৩৯৭) এটা হলো তাঁর (ইবুনল কায়্যেম রাহঃ) অভিমত। তবে মসজিদে প্রবেশকারীর প্রথমে সালাম করা যাবে না এমন কোন দলীল নেই। তাছাড়া কখনো (মানুষ থেকে) দূরে মসজিদের এক কিনারায় হবে, তখন আগে নামায আদায় করবে তারপর এসে সালাম করবে। আর উত্তম হলো, মুসলিম যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে তার মুসলিম ভাইদেরকে আগে সালাম করবে তারপর দু'রাকআত নামায আদায় করবে।

আপনার নফল অথবা ফরয নামায আদায় করা অবস্থায় কোন মুসলিম যদি আপনাকে সালাম করে, তাহলে মুসলিম শরীফ ও অন্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত সহী হাদীস অনুযায়ী এ ব্যাপারে সুন্নত হলো, (হাত দ্বারা ইশারা করে সালামের উত্তর দিবেন।) আপনার হাতকে বিছিয়ে দিয়ে উহার অভ্যন্তরকে যমীনের দিকে করবেন এবং বাহ্যিককে আপনার চেহারার দিকে করবেন। (মুসলিম ৫৪০)

নামায পড়া অবস্থায় আপনি মুখে 'আলাইকুম সালাম' বলবেন না। কোন কোন আলেম বলেছেন, আপনি আপনার তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবেন। তবে হাত বিছিয়ে উত্তর দেওয়াই আলেমদের নিকট উত্তম এবং এটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি।

৫। পরিবারকে সালাম দেওয়ার আদবঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) রাতে যখন পরিবারের নিকটে প্রবেশ করতেন, তখন এমনভাবে সালাম করতেন যে, ঘুমন্তকে জাগাতেন না এবং জাগ্রতকে শুনাতেন। (মুসলিম ২০৫৫) অতএব কোন মানুষ তার পরিবারের নিকট প্রবেশ ক'রে চেঁচিয়ে সালাম ক'রে তাদেরকে জাগিয়ে দেবে না। লক্ষ্য করুন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর অনুকম্পা এবং তাঁর কোমল ও নির্মল হৃদয়ের প্রতি। আর 'আস্সালামু ক্বাবলাল কালাম' এই হাদীস বাতিল, শুদ্ধ নয়। এই হাদীস তিরমিযী শরীফে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু হাদীসের সানাদে আম্বাসা ইবনে আব্দুর রাহমান রয়েছেন যার মিথ্যুক হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আবু হাতিম তাকে (মনগড়া) হাদীস রচনাকারী আখ্যাও দিয়েছেন। অনুরূপ আম্বাসার উসতাদ মুহাম্মাদ ইবনে জাযানেরও মিথ্যুক হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কাজেই হাদীসটি বাতিল। (তবে আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ২৬৯৯)

৬। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সালাম করার বিধানঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের আগে সালাম করতেন না। বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ))

অর্থাৎ, "ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের আগে সালাম করবে না।" (মুসলিম ২১৬৭, আবু দাউদ ৫২০৫, তিরমিযী ১৬০২) কাজেই যে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে কাজ করে, তার পদ্ধতি হবে যে, সে তাদেরকে আগে সালাম করবে না। তবে তারা যদি সালাম করে, তাহলে কেবল বলবে, 'অ আলাইকুম'। একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে কিছু মুসলিম ছিলেন এবং মূর্তির পূজারী মুশরিক ও ইয়াহুদীরাও ছিলো। তিনি সেখানে (সাধারণভাবে) সালাম করলেন। (বুখারী ২৯৮৭-মুসলিম ১৭৯৮) তাই আপনি যদি এমন কোন মজলিস হয়ে যান যেখানে মুসলিমগণ আছেন (এটা শর্ত) এবং ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানও আছে, সেখানে শরীয়তী সালাম পেশ করতে পারবেন। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হিরাকিলউস (Heraclius) ও অন্যান বাদশাদের পত্রে লিখেছিলেন, "আস্‌সালামু আ'লা মানিত্তা-বাআ'ল হুদা" (বুখারী ৭-মুসলিম ১৭৭৩) মহান আল্লাহর কিতাবেও এটা উল্লিখিত হয়েছে। ফেরাউনের জন্য মূসা (আঃ)-এর উক্তি ছিলো,

﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴾. [طه:٤٧].

অর্থাৎ, "যে সৎপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি।" (সূরা ত্বোহাঃ ৪৭) আপনিও যখন ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের কাউকে সালাম করবেন অথবা তাদেরকে পত্র লিখবেন, তখন বলবেন, 'আস্‌সালামু আ'লা মানিত্তাবাআ'ল হুদা'। তবে তাদেরকে আগে সালাম করবেন না।

৭। অবাধ্যজনকে সালাম না করা যাতে সে তাওবা করেঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিয়ম ছিলো যে, তিনি এমন ব্যক্তিকে সালাম করতেন না এবং তার সালামের উত্তরও দিতেন না, যে কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলতো, যতক্ষণ না সে তা থেকে তাওবা করতো। যেমন তিনি কা'ব ইবনে মালিক ও তাঁর সাথীদ্বয়ের সাথে করেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে আগে সালাম করতেন না। বরং কা'ব ইবনে মালিক বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে সালাম করতাম, কিন্তু জানি না তিনি আমার সালামের উত্তর দিতেন কি না এবং উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর ঠোঁট নড়তো কি না? (বুখারী ২৭৫৮-মুসলিম ২৭৬৯) যে বিদআ'তীর বিদআ'তী কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা যাবে অথবা যে দ্বীনে নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করবে, তার সাথেও অনুরূপ করা হবে। আপনি তাকে সালাম করবেন না এবং তার সালামের উত্তরও দিবেন না, যতক্ষণ না সে তাওবা করেছে। তবে এর পূর্বে তাকে নসীহত করতে হবে, ভয় দেখাতে হবে এবং দ্বীনে বিদআ'তী কাজ ত্যাগ করার প্রতি তাকে উৎসাহ দান করতে হবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়াই জামাআ'ত সহকারে নামায আদায় করে না, অথচ সে মসজিদের পাশেই থাকে, সব রকমের অসুবিধা থেকে মুক্ত এবং (শারীরিক দিক দিয়ে) সুস্থও, তার সাথে সালাম না করা এবং তার সালামের উত্তর না দেওয়া আপনার জন্য জায়েয, যতক্ষণ না সে জামাআ'তের সাথে নামায পড়া আরম্ভ করেছে। তবে আবূ আয়্যূব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যে বলেছেন,

((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ))

অর্থাৎ, "কোন মুসলিমের জন্য তার কোন (মুসলিম)ভাইকে তিন দিনের বেশী ত্যাগ করে রাখা বৈধ নয়। এরা উভয়ে যখন মুখো-মুখী হয়, তখন একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে এদের উভয়ের মধ্যে যে আগে সালাম করবে, সে-ই হবে উত্তম।" (বুখারী ৬০৭৭-মুসলিম ২৫৬০) এটা হচ্ছে পার্থিব সম্পর্কীয় বিষয়ে। পার্থিব বিষয়ে ক্রোধ ও রোষ তিন দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যেতে হবে। তিন দিন পর (একে অপর থেকে) বিচ্ছিন্ন থাকা হারাম হবে। কিন্তু দ্বীনী ব্যাপারের কারণে যার সাথে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে তা ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হবে না, যতক্ষণ না সে স্বীয় ভুল থেকে ও বিদআ'তী কার্যকলাপ থেকে তাওবা করেছে।

দ্বিতীয়তঃ দাওয়াত কবুল করাঃ

১। মুসলিমের দাওয়াত কবুল করার বিধানঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর উক্তি "যখন তোমাকে কেউ দাওয়াত করবে, তখন তা গ্রহণ করো।" (বুখারী ১২৪০-মুসলিম ২১৬২) এই দাওয়াত কবুল করাও ভালবাসার সেতুসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তবে এই দাওয়াতসমূহের মধ্যে কোন দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব, কোনটা সুন্নত এবং কোনটা কবুল করা হারাম। যে দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব তা হলো বিবাহের দাওয়াত। যদি সেখানে কোন গর্হিত কাজ না হয়। ইবনে উমার (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا))

অর্থাৎ, "যখন তোমাদের কাউকে (বিবাহের) ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তাতে অংশগ্রহণ করে।" (বুখারী৫১৭৩-মুসলিম ১৪২৯) আর ওলীমা বলতে বিবাহের ওলীমা বুঝায়। কারণ অভিধানের কিতাবে বিবাহের দাওয়াতকেই ওলীমা নামে অভিধিত করা হয়েছে। আর মুসলিম শরীফের শব্দ হলো,

((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْساً كَانَ أو نحوه))

অর্থাৎ, "যখন কেউ তার ভাইকে দাওয়াত দেয়, তখন সে যেন তা কবুল করে। তাতে তা বিবাহের দাওয়াত হোক বা অন্য কিছুর।" (মুসলিম১৪২৯) আলেমগণ বলেছেন, এখানে যে নির্দেশ তা অপরিহার্য হওয়ার দাবী রাখে। অর্থাৎ, শরীয়তের দিক থেকে আপনার উপর অপরিহার্য হলো যে আপনি আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ কবুল করবেন, যদি সেখানে কোন গর্হিত ও শরীয়ত বিরোধী কাজ না হয়।

২। <u>দাওয়াতের আদবঃ</u>

আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَن يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَن يَأْبَاهَا، وَمَن لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ))

অর্থাৎ, "এমন ওলীমা হচ্ছে নিকৃষ্ট ওলীমা, যাতে আসতে এমন লোকদের বাধা দেওয়া হয়, যারা আসতে চায়। আর যারা আসতে

রাযী নয়, তাদেরকে দাওয়াত করা হয়। আর যে দাওয়াত কবুল করলো না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলো।" (বুখারী ৫১৭৭-মুসলিম ১৪৩২) যে ওলীমা লোকপ্রদর্শন ও সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় এবং যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয় ও গরীবদের বাদ দেওয়া হয়, সে ওলীমা হলো অতীব নিকৃষ্টতম ওলীমা। অনুরূপ মুসলিম শরীফে (১৪৩০) এসেছে,

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ))

অর্থাৎ, "তোমাদের কাউকে যখন খাবার জন্য দাওয়াত করা হয়, তখন সে যেন তা গ্রহণ করে। পরে ইচ্ছা হলে খাবে, না হয় ত্যাগ করবে।" অতএব আপনি উপস্থিত হবেন। আর এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, আপনাকে খেতেই হবে। কারণ, বর্তমানে যখন কোন ওলীমার দাওয়াত করা হয়, তখন অনেকে বলে, পারবো না, আমি খেয়ে নিয়েছি অথবা বলে, খাওয়ার ইচ্ছা নেই। এটা ভুল। উদ্দেশ্য কেবল এই নয় যে, আপনি খাবেন। আপনি উপস্থিত হয়ে তাদের জন্য দুআ করুন এবং তাদের সাথে কথা বলুন ও তাদের সাথে আন্তরিকাতার পরিচয় দিন। কেননা, সালফে-সালেহীনদের অনেকে রোযা থাকা অবস্থায় (দাওয়াতে) শরীক হতেন এবং তাঁরা বাড়িওয়ালাদের সুন্দর চরিত্রের পরিচয় পেয়ে তাদের জন্য দুআ করতেন। ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ الْوَلِيمَةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ

الْوَلِيْمَةِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سمَّع سمَّع اللهُ بِهِ))

অর্থাৎ, "প্রথম দিনে ওলীমার ব্যবস্থা করা হলো সাব্যস্ত বা ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় দিনে উহার ব্যবস্থা করা সুন্নত। তৃতীয় দিনে করলে তা হবে খ্যাতি লাভের জন্য। আর যে নাম কামানোর জন্য বা খ্যাতি অর্জনের জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ (মানুষের মাঝে) তার নামের প্রচার করে দেন।" (পরে কোন নেকী সে পায় না) (আবু দাউদ ও আহমদ, হাদীসটি দুর্বল। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৩৭৪৫) ইমাম বুখারীও হাদীসটিকে দুর্বল মনে করেন। কারণ, তিনি বুখারী শরীফে বলেছেন, (ওলীমা) একদিন না দু'দিন করবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর কোন দিন ধার্য করেন নি। (বুখারী ৬/ ১৪৩) তাই মানুষ একদিন অথবা দু'দিন বা তিনদিনেরও বেশী করতে পারে। তবে কেবল একদিন এবং একটি ওলীমা করাই হলো সুন্নতের কাছাকাছি। আর উদ্দেশ্য হলো, দাওয়াত কবুল করা যদি সেখানে কোন অন্যায় কাজ না হয়। যদি একই দিনে বা বিভিন্ন দিনে দুইজনের পক্ষ হতে দাওয়াত আসে, তাহলে যে আগে দিয়েছে তারটা কবুল করুন এবং দ্বিতীয়জনের কাছে অপারগতা পেশ ক'রে বলুন, অমুক আপনার আগেই দাওয়াত দিয়েছে। আমন্ত্রণকারীরা সবাই যদি একই পর্যায়ের হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে আগে আমন্ত্রণ করছে তারটা কবুল করাই শ্রেয়। তবে প্রতিবেশী ও নিকট আত্মীয় এক সঙ্গে দাওয়াত করলে, নিকট আত্মীয়ের দাওয়াতটা কবুল করা আপনার জন্য উত্তম। আগেই বলা হয়েছে যে, যদি সেখানে কোন অন্যায় কাজ হয়, তাহলে সে (দাওয়াতে) শরীক হবে না। তবে যদি মনে করা হয় যে,

তার উপস্থিতি অন্যায়ের জন্য প্রতিকার অথবা অন্যায়ের পথে প্রতিবন্ধকতা হবে, তাহলে সে অবশ্যই উপস্থিত হবে।

তৃতীয়তঃ দ্বীনের মূল শিক্ষাই হলো নসীহত করাঃ

১। নসীহত করা ওয়াজিবঃ

হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর উক্তি,

((وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ))

অর্থাৎ, "যখন কেউ তোমার কাছে উপদেশ চাইবে, তখন তাকে উপদেশ দাও।" (বুখারী ১২৪০-মুসলিম ২ ১৬২) এটা তৃতীয় আদব যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন। এটা ভালবাসার নিদর্শন এবং আমাদের একে অপরের প্রতি শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত অপরিহার্য বিষয়। আলেমদের নিকট (পরস্পরকে) নসীহত করা ওয়াজিব। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لله وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ))

অর্থাৎ, "দ্বীন (দ্বীনের মূল শিক্ষা) হচ্ছে একে অপরকে নসীহত করা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিমদের ইমাম (নেতা) এবং সকল সাধারণ মানুষের জন্য।" (মুসলিম ৫৫) অনুরূপ বুখারী (২৪৪৩) ও মুসলিম (২৫৮৪) শরীফে নসীহত অধ্যায়ের কথা বলতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوْماً، قُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوْماً، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِماً؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ))

অর্থাৎ, "তোমার ভাইয়ের সাহায্য করো, চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে অত্যাচারিত তার সাহায্য করবো আমরা, কিন্তু যে অত্যাচারী তার সাহায্য কিভাবে করবো? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, ওর হাত দু'টি ধরে অত্যাচার করা থেকে বাধা দেবে। এটাই হবে তার সাহায্য করা।" তাই আমাদের উপর ওয়াজিব হলো যে, আমরা পরস্পরকে নসীহত করবো। মানুষ ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা পায় না। আমাদের অনেক কার্যকলাপে ভুল-চুক হয়েই যায়। ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন কেবল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাই যে ভাই তার অপর ভাইকে কোন (দ্বীনি) মসলা-মাসায়েলে অথবা বিবেক-বিচারে কিংবা কোন কর্মে বা পদ্ধতিতে ভুল করতে দেখবে, তখন তার জন্য অপরিহার্য হবে তার কাছে গিয়ে তাকে নসীহত করা। আর নসীহতকারী ভালবাসা, দুআ, প্রসন্নতা এবং সুন্দর অভ্যর্থনা বই কিছুই পাবে না। আলী (রাঃ) বলেন, মু'মিনরা হয় নসীহতকারী আর মুনাফেক্বরা হয় প্রতারক। কাজেই আপনি যদি কোন এমন মানুষকে দেখেন, যে অন্য কাউকে তার ভাইদের কুৎসা গাইতে এবং মজলিসে তাদের সমালোচনা করতে ও তাদের সম্ভ্রমের উপর আক্রমণ করতে দেখে তারপরও তাকে নসীহত করে না তাহলে জানবেন সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের সাথে প্রতারণাকারী। আর মু'মিনের নিদর্শন হলো, যখন সে তার ভাইয়ের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের ইচ্ছা করে, তখন তার কাছে যায়

এবং তাকে পৃথকভাবে নেয় তারপর তাকে নসীহত করে, তাকে সঠিক পথের দিশা দেয়, তার প্রতি সদয় হয় এবং তার সাথে নরম আচারণ করে ও তার জন্য বিনম্র হয়। এইভাবে সে তার দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে, প্রকৃতই সে যদি নসীহত করার ইচ্ছ করে। কিন্তু সে যদি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রচার করতে চায়, তাহলে তার মালিক আল্লাহ। তিনি তার হিসাব নিবেন এবং তার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত।

মহান আল্লাহ তাঁর গ্রন্থে আম্বিয়াদের দাওয়াতের পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের দাওয়াতের ভিত্তি ছিলো নসীহত। নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন,

﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ ﴾. [الأعراف:٦٢].

অর্থাৎ, "তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই।" (সূরা আ'রাফঃ ৬২) তিনি তাদেরকে এ কথাও বলেন যে,

﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ﴾. [هود:٣٤].

অর্থাৎ, "আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না।" (সূরা হূদঃ ৩৪) অনুরূপ সালেহ (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন,

﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾. [الأعراف:٩٣].

অর্থাৎ, "আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি

এবং তোমাদেরকে নসীহত করেছি।" (সূরা আ'রাফঃ ৯৩) এঁরা ছিলেন আল্লাহর পয়গাম্বর এবং তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। আর যে কোন জাতির অনুকরণ করে, সে তাদেরই একজন গণ্য হয়।

২। নসীহত করার আদবঃ

নসীহত করার তিনটি আদব রয়েছে। যথা (১) ইখলাস, (২) কোমলতা, (৩) গোপনীয়তা। নসীহত যে গোপনে করতে হয় এ ব্যাপারে অনেকে ভুল করে। আমরা কেউ ভুলের উর্ধ্বে নই। পুনরায় এটা আমি বলছি যাতে নসীহতকারী জেনে নেয় যে, ভুল-ত্রুটি হওয়া এমন স্বাভাবিক জিনিস যা প্রাকৃতিকভাবেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই তাকে নসীহত করার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবে না। উমার (রাঃ) বলতেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, যে আমার দোষগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়। তিনি সাহাবাদের কাছে শুনতেন তাঁরা তাঁকে নসীহত করতেন।

চতুর্থতঃ হাঁচির উত্তর দেওয়াঃ

১। হাঁচির উত্তর কখন দেবে এবং উহার তরীকাঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হাদীসে বলেছেন,

((إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ))

অর্থাৎ, "যখন কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলে, তখন তার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলো।" (মুসলিম ২১৬২) তিনি আরো বলেন,

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ))

অর্থাৎ, "আল্লাহ হাঁচি ভালবাসেন এবং হাইতুলাকে অপছন্দ

করেন।" (বুখারী ৬২২৩) হাঁচি আসা আল্লাহ কর্তৃক রহমত এবং হাইতুলা শয়তান কর্তৃক হয়। কারণ, হাঁচি দিলে অন্তরের ধমনীগুলো খুলে উঠে এবং বক্ষ উন্মুক্ত হয়। তাই তা আল্লাহ কর্তৃক রহমত। আল্লাহই এর রহস্য সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত। অতএব আপনার উপর অপরিহার্য হলো 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলা। আর হাই এলে তা সাধ্যানুসারে রোধ করার চেষ্টা করুন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আরো বলেছেন,

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ أَو صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ))

অর্থাৎ, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিলে, সে যেন 'আল-হামদু লিল্লা-হ' বলে, তখন তার অপর ভাই অথবা তার সাথী-সঙ্গী যেন বলে, 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' তাকে যখন 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলে, তখন সে যেন বলে, 'ইয়াহদীকুমুল্লাহু অ ইউস্‌লিহ বালাকুম'।" (বুখারী ৬২২৪) অনুরূপ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلاَنِ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتْ الآخَرَ، فَقَالَ الَّذِيْ لَمْ يُشَمِّتْهُ: عَطَسَ فُلاَنٌ فَشَمَّتَّهُ، وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمِّتْنِي، قَالَ: إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ، وَ إِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللهَ))

অর্থাৎ, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকটে দুই ব্যক্তি হাঁচি দিলো। তাদের একজনের উত্তরে তিনি 'ইয়ারহামুকাল্লা -হ' বললেন এবং অপর জনের জন্য বললেন না। যার জন্য বললেন না, সে তখন বললো, অমুক হাঁচি দিলে আপনি 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'

বললেন। আর আমি হাঁচি দিলাম কিন্তু আমাকে 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বললেন না। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, সে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলেছে। কিন্তু তুমি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলো নি।" (বুখারী ৬২২৫-মুসলিম ২৯৯১) আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوْهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلاَ تُشَمِّتُوْهُ))

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলে, তার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলো। কিন্তু সে যদি 'আলহামদু লিল্লা-হ' না বলে, তাহলে তোমরা 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলবে না।" (মুসলিম ২৯৯২, আহমাদ ৪/৪১২) হাদীস থেকে জানা গেলো যে, যে ব্যক্তি 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলবে, তার জন্য 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলা আমাদের উপর অপরিহার্য হবে। আর সে যদি হাঁচি দিয়ে চুপ থাকে, 'আলহামদু লিল্লা-হ' না বলে, তাহলে আপনিও 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলবেন না, বরং চুপ থাকবেন।

২। হাঁচির উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলা কি সকলের উপর ফরয, না কোন একজন বললেই হবে?

মালিকী মাযহাবের ইবনে যায়েদ এবং ইবনুল আরাবীর মত হলো, 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ বলা সকলের উপর ফরয। আর এটাই সঠিক উক্তি। কাজেই মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিরা যখন 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলতে শুনবে, তখন সকলেই 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলবে। তাদের মধ্য থেকে কেবল একজনের বলা যথেষ্ট হবে না। এটা ফার্য

আ'ইন, (যা করা সকলের উপর ফরয) ফার্‌য কেফায়া (যা কেউ কেউ করলেই যথেষ্ট হয় তা) নয়। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর তরীকা ছিলো যে, তিনি যখন হাঁচি দিতেন, তখন স্বীয় হাত অথবা কোন কাপড় মুখে রেখে নিতেন এবং শব্দকে দমন করতেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৫০২৯-২৭৪৫) তাই সুন্নত হলো, মুসলিম ব্যক্তি হাঁচি দেওয়ার সময় জোরে শব্দ করবে না।

দু'টি দুর্বল হাদীসের প্রতি ইঙ্গিতঃ

প্রথম হাদীস হলো, "জোরে হাইতুলা এবং সজোরে হাঁচি দেওয়া শয়তান কর্তৃক।" (হাদীসটি ইবনুস্‌সুন্নী তাঁর 'আমালুল ইয়াওম অল্লায়লা' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসটি দুর্বল, সহী নয়। আল্লামা আলবানী (রাহঃ)ও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। দ্রষ্টব্যঃ যাঈফুল জামে' ২৫০৫)

দ্বিতীয় হাদীস হলো, "অবশ্যই আল্লাহ শব্দ ক'রে হাইতুলা ও হাঁচি দেওয়াকে অপছন্দ করেন।" হাদীসটি দুর্বল, সহী নয়। (হাদীসটি ইবনুস্‌সুন্নী তাঁর 'আমালুল ইয়াওম অল্লায়লা' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আলবানী (রাহঃ)ও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। দ্রষ্টব্যঃ যাঈফুল জামে' ১৭৫৬)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلاَثًا، فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ))

অর্থাৎ, "তোমার ভাইকে কেবল তিনবার 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলো। তিনবারের বেশী (হাঁচি দিলে) হলে, তা হবে সর্দির কারণে।"

(আবূ দাউদ, হাদীসটি হাসান। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবু দাউদ আলবানীঃ ৫০৩৪) অথাৎ, প্রথম হাঁচি দিয়ে যখন বললো, 'আলহামদু লিল্লা-হ' তখন আপনি বলুন, 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'। অনুরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীবারও বলুন, 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'। চতুর্থবারে তাকে বলুন, 'আ'ফাকাল্লা-হ' (আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন)। এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর কাছে হাঁচি দিলে তাকে তিনি বললেন, 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'। সে পুনরায় হাঁচি দিলে তিনি বললেন, ((اَلرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ)) "লোকটা সর্দি রোগে আক্রান্ত" (মুসলিম ২৯৯৩)

হাদীসে "লোকটা সর্দি রোগে আক্রান্ত" উক্তির দ্বারা তার জন্য দুআ করার চেতনা দেওয়া হয়েছে। কেননা এটা একটি রোগ। আর তৃতীয়বারের পর 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' না বলার কারণও এতে রয়েছে। অনুরূপ তাকে (যে হাঁচি দিয়েছে) সতর্ক করা হচ্ছে যে, এটা রোগ তার জানা দরকার এবং এ ব্যাপারে উদাসীন হওয়া ঠিক নয়। পরে তা আরো কঠিন হয়ে যেতে পারে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সব কথাই কৌশল, রহমত এবং জ্ঞান ও হেদায়াতে পরিপূর্ণ। (যাদুল মাআ'দ ২/ ৪৪১) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ইবনে মাজায় বর্ণিত হাদীসে বলেছেন,

((يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلاَثًا، فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُوْمٌ))

অর্থাৎ, "হাঁচিদাতাকে তিনবার 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলা হবে। তিনের অধিকবার হাঁচি দিলে (মনে করতে হবে) সে সর্দি রোগে আক্রান্ত।" (হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে ইবনে মাজা আলবানীঃ

২৭১৪) আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনের অধিকবার হাঁচি দিলে সাথীর আরোগ্যের জন্য দুআ করবে।

মাসআলাঃ আপনি যদি হাঁচিদাতার 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলা না শুনেন আর আপনার পাশের সাথী যদি তা শুনে থাকে, যখন আপনি জানতে পারবেন যে, সে 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলেছিলো, তখন আপনি কি করবেন? আপনি না শুনে থাকলেও বলুন, 'ইয়ারহা-মুকাল্লা-হ'। কিন্তু যদি জানতে না পারেন, তাহলে 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলবেন না।

দ্বিতীয় মাসআলাঃ হাঁচিদাতা যদি 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলতে ভুলে যায়, তাকে কি আপনি স্মরণ করিয়ে দেবেন? ইমাম নওবী সহ কিছু আলেমগণ এই (স্মরণ করিয়ে দেওয়ার) মতের পক্ষে গেছেন এবং এটাকে তাঁরা ভাল মনে করেছেন। ইব্রাহীম তামিমী এই রকম করতেন। অনুরূপ ইবনুল মুবারাকও করতেন। তাঁর কাছে একজন হাঁচি দিলো কিন্তু 'আলহামদু লিল্লা-হ' বললো না। তখন তিনি (ইবনুল মুবারাক) বললেন, মানুষ হাঁচি দেওয়ার পর কি বলবে? সে বললো, 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলবে। তখন তিনি বললেন, 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'। এটা একটি উক্তি।

সঠিক উক্তি হলো, তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আপনার জন্য জরুরী নয়। কারণ, তাকে স্মরণ করিয়ে যদি আপনার জন্য অত্যাবশ্যক হতো, তাহলে যে হাঁচি দেওয়ার পর 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলেনি, তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) অগ্রণী ভূমিকায় থাকতেন। অথচ তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন নাই। এটা তার শিক্ষা এবং দুআর বরকত থেকে

বঞ্চিত করার জন্য। কেননা সে নিজেকে 'হাম্‌দ'এর বরকত থেকে বঞ্চিত করেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর মজলিসে লোকে পরস্পর হাঁচি দিতো তিনি তাঁদেরকে স্মরণ করিয়েও দিতেন না এবং তাঁদেরকে 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' বলতেন না। এটাই হলো সঠিক ও প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি। ইয়াহুদীরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকটে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলতো। তিনি উত্তরে বলতেন 'ইয়াহদীকুমুল্লাহু অ ইউস্‌লেহ বালাকুম' (আবূ দাউদ ও তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী আলবানীঃ ৫০৩৮-২৭৩৯) লক্ষ্য করুন হিকমতের প্রতি, ইয়াহুদীদের হেদায়াতের প্রয়োজন। তারা রহমত পাওয়ার যোগ্য নয়। অতএব তাদের জন্য কি রহমতের দুআ করা হবে, অথচ ওরা বিরোধিতা করছে? না। বরং তাদের প্রয়োজন হলো, আল্লাহ তাদেরকে প্রথমে হেদায়াত দান করুন তাদের প্রতি রহম করার পূর্বে। আর এই জন্যেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) 'ইয়ারহামুকাল্লা-হ' না বলে, বললেন, 'ইয়াহদীকুমুল্লাহু অ ইউস্‌লেহ বালাকুম'।

পঞ্চমতঃ রোগীকে দেখতে যাওয়াঃ

১। রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং তার জন্য দুআ করার ফযীলতঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ))

অর্থাৎ, "যখন সে অসুস্থ হয়, তখন তাকে দেখতে যাও।" (মুসলিম ২১৬২) মুসলিমদের মাঝে ভালবাসার সেতুসমূহের এটা আর এক সেতু। তাই মুসলিমের অপর মুসলিমের প্রতি অধিকার

হলো, যখন সে অসুস্থ হবে, তখন তাকে দেখতে যাবে। আর দেখতে যাওয়ার কিছু আদব রয়েছে এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক কিছু ফযীলতও রয়েছে। সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ عَادَ مَرِيْضاً لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ)) وفي لفظ : ((قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: ((جَنَاهَا))

অর্থাৎ, "যে কোন রোগীকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফলমূলের বাগানে অবস্থান করতে থাকে।" অপর বর্ণনায় এসেছে যে, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের ফলমূলে অবস্থান করা কি? তিনি বললেন, "তা সংগ্রহ করা।" (মুসলিম ২৫৬৮) অর্থাৎ, সে যেন জান্নাতের বাগানসমূহে চলাফেরা করতে থাকে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের দেখতে যেতেন। তিনি সা'দ ইবনে আবূ অক্কাস ('রাযীআল্লাহু আনহু অ আরযাহু'/আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করেন!)কে দেখতে যান, তাঁর জন্য দুআ করেন এবং বলেন,

((وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ))

অর্থাৎ, "হতে পারে তুমি (অন্যান্য সাহাবীদের পরেও) জীবিত থাকবে। ফলে এক জাতি (মুসলিমরা) তোমার দ্বারা উপকৃত হবে এবং অপর জাতি তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (বুখারী ৫৬-মুসলিম ১৬২৮) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) জাবির (রাঃ)কে দেখতে গিয়ে দেখেন যে, তিনি (জাবির) অজ্ঞান। তখন

তিনি অযু ক'রে তাঁর উপর পানির ছিটা মারলে তিনি জ্ঞান ফিরে পান। অনুরূপ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) একজন গ্রাম্য লোককে দেখতে যান। তার কাছে প্রবেশ ক'রে বলেন,

((لاَ بَاْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ)) قَالَ (اَلْأَعْرَابِي) قُلْتَ: طَهُوْرٌ، كَلاَّ، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُوْرُ أَو تَثُوْرُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ. فَقَالَ النبي ﷺ: فَنَعَمْ إِذاً))

অর্থাৎ, "চিন্তার কোন কারণ নেই আল্লাহ চাইতো গুনাহ মাফ হবে। সে (লোকটি) তখন বললো, আপনি বলছেন, গুনাহ মাফ হবে, কখনোও না বরং এটা এমন জ্বর যা কোন বৃদ্ধকে আক্রমণ করলে তাকে কবর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, তাহলে তা-ই হবে যা তুমি মনে করো।" (বুখারী ৫৬৫৬) এই জ্বরই তাকে ধ্বংস করেছিলো। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন, তখন তার জন্য দুআ করতেন এবং তার মাথার কাছে একটু বসে তার বুকের উপর স্বীয় মমতা মাখানো হাত রাখতেন। আর এটা হলো আন্তরিকতা ও সমবেদনার প্রকাশ।

২। রোগীকে দেখতে যাওয়ার কিছু আদবঃ

'আহলে সুন্নাহ'র নিকট রোগীকে দেখতে যাবে প্রত্যেক তিন দিনের মাথায়। তবে রোগী যদি কোন নিকট আত্মীয় হয়, যেমন পিতা, ছেলে, আপন ভাই এবং যারা এদের আওতায় পড়ে, তাহলে তার কথা ভিন্ন। আর অন্য কেউ হলে, আপনি প্রত্যেক তিন দিনের মাথায় তাকে দেখতে যাবেন। কিন্তু আপনার প্রত্যেক দিন তার কাছে আসা অথবা সকালে একবার ও সন্ধ্যায় একবার আসা এটা

বিরক্তিকর। ইমাম যাহাবী সুলাইমান ইবনে মেহরান (যার উপাধি ছিলো আ'মাশ)-এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এক দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হোন। মানুষ তাঁর নিকট প্রবেশ করে এবং বার বার তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করে তুলে। তাই তিনি তাঁর রোগের বিবরণ একটি কাগজের মধ্যে লিখে যে বালিশে তিনি ঘুমাতেন তার নীচে রেখে দেন। যখনই কেউ তাঁকে তাঁর রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাকে এই কাগজ বের ক'রে বলেন, পড়ে নাও। যখন মানুষের আসা-যাওয়া বেড়ে গেলো, তখন তিনি লাফিয়ে উঠে বালিশটা বগলের মধ্যে দাবিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, আল্লাহ তোমাদের রোগীকে আরোগ্য দান করুন!

মুসলিমের উচিত রোগী দেখার জন্য এমন সময়ের খোঁজ করা যা তার (রোগীর) জন্য উপযুক্ত হয়। কাজেই তা যেন তার ঘুমানোর, খাওয়ার এবং নামাযের সময় না হয়। আর এমন সময়ও যেন না হয়, যে সময় সে মনে করে যে, রোগী এ সময়ে বিশ্রাম নেয়। বরং দেখতে যাওয়ার উপযুক্ত সময়ের খোঁজ করবে। অনুরূপ এটাও রোগী দেখতে যাওয়ার আদবের আওতাভুক্ত জিনিস যে, তার কাছে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকবে না। কারণ, অনেকেই যখন রোগীকে দেখতে যায়, তখন তারা তার রোগের উপর আর এক রোগ বৃদ্ধি করে দেয়। এক দু'ঘন্টা পর্যন্ত তার কাছে বসে থাকে। অথচ এটা রোগী দেখতে যাওয়ার আদবের আওতায় পড়ে না। অতএব যখন আপনি রোগীকে দেখতে যাবেন, তার রোগ যদি হালকা হয়, আপনি তার শরীরিক উন্নতি হওয়ার এবং তার রোগ যে অতীব সামান্য এ কথা বলবেন। আর বলবেন যে, 'মাশা আল্লা-হ' আমি আশাই করি নি

যে আপনার অবস্থা এ রকম। আপনার স্বাস্থ্য ও অবস্থা এখন খুবই ভাল। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন! 'ইনশা আল্লা-হ' অতি সত্বর আপনি এই রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। এই ধরনের আরো কথা। কোন অন্য ভাবমূর্তি নিয়ে কেউ রোগী দেখতে এসে তার রোগের উপর আরো রোগ যেন বাড়িয়ে না দেয়। অনেক মানুষ-আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করুন!-রোগীকে এই অনুভূতি দেয় যে, তার অবস্থা খুবই খারাপ। তার রোগের কোন চিকিৎসাই নেই। তার উচিত স্বীয় সম্পদের ওসীয়ত করা এবং যে সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে তা বন্টন করে দেওয়া। এইভাবে তারা রোগীকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করে। এটা ভুল। কেননা, মানসিক অবস্থার বড়ই গুরুত্ব আছে। আপনি যখন তাকে এই অনুভূতি দিবেন যে, সে সুস্থ ও রোগমুক্ত, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আপনার এই কথা তাঁর আরোগ্য লাভের কারণ হতে পারে। আর এই কারণেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন, তখন বলতেন, "কোনই ব্যাপার নয়, আল্লাহ চাহেতো গুনাহ মাফ হবে।" এই ধরনের আরো কথা যা পূর্বে এক গ্রাম্য লোককে দেখতে যাওয়া ব্যাপারে উল্লেখ হয়েছে।

আলেমগণ বলছেন, আপনি যদি এমন লোকের কাছে যান, যে আখেরাতের অতি নিকটে হয়ে গেছে এবং সে এমন রোগে আক্রান্ত যার আরোগ্য লাভের আশা নেই, তাহলে আল্লাহর ব্যাপারে এবং তাঁর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে তাকে সুন্দর ধারণা দিন। আর আল্লাহর কাছে তার আশা পূরণ হবে এই রকম সুন্দর ধারণা দিন। রোগী দেখতে যাওয়ার এটাই হলো সুন্নত। অনুরূপ রোগীর যিয়ারতকারী

রোগীর সামনে পার্থিব বিষয়ে এবং খুব বেশী হাসি-ঠাট্টা ও অনুপযুক্ত কথা-বার্তা আলোচনা করবে না। বরং সংক্ষিপ্ত যিয়ারত করে চলে যাবে।

ষষ্ঠতঃ জানাযায় শরীক হওয়াঃ

১। জানাযায় শরীক হওয়ার ফযীলতঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেনে,

((وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ))

অর্থাৎ, "যখন সে মারা যায়, তখন তার জানাযায় শরীক হও।" (মুসলিম ২ ১৬২) মুসলিমের অপর মুসলিমের উপর এই অধিকার। এমন কি লাশ হয়ে তার আত্মা ইল্লিয়্যীনে পৌছে যাওয়ার পরও আপনার উপর দাবী হলো, আপনি তার জানাযায় শরীক হয়ে তার অধিকার আদায় করুন। তার জানাযা পড়া অবস্থায় তার জন্য সুপারিশ করুন। সে মাটির নীচে থাকা অবস্থায়ও তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। দুআর মাধ্যমে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং তার অনুপস্থিতিতেও তার জন্য দুআ করুন। এটাই হলো ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং ঈমানী বন্ধন। মুসলিমদের পারস্পরিক অধিকারগুলো কেবল জীবনের সাথেই সীমিত নয়, বরং মৃত্যুর পরেও তাদের পারস্পরিক অধিকার বাকী থাকে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا))

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন জানাযায় শরীক হয়ে তিনবার তা বহন করলো, সে তার উপর আরোপিত অধিকার আদায় করলো।"

(তিরমিযী, হাদীসটি দুর্বল। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানীঃ ১০৪১) তবে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ، قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ))

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন জানাযায় শরীক হয়ে নামায আদায় করা পর্যন্ত থাকে, সে এক ক্বীরাত নেকী পায়। আর যে তাতে শরীক হয়ে কবরস্থ করা পর্যন্ত থাকে, সে দু'ক্বীরাত নেকী পায়। জিজ্ঞাসা করা হলো দুই ক্বীরাত কি? তিনি বললেন, দু'টি বড় বড় পাহাড়ের সমান।" (বুখারী ৪৭-মুসলিম ৯৪৫) লক্ষ্য করুন! কাজ অত্যন্ত সহজ, কিন্তু নেকী অতীব মহান।

২। জানাযায় এবং (শোকাহতদের) প্রতি সমবেদনা প্রকাশের আদবঃ

সুন্নত হলো জানাযার সামনে হাঁটা। এর ফযীলতও রয়েছে। ইবনে উমার (রাঃ) বলেন,

((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ))

অর্থাৎ, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে এবং আবূ বাকার ও উমার (রাযী আল্লাহু আনহুমা)কে দেখেছি জানাযার সামনে হাঁটতে। (তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা আলবানীঃ ১০০৭-১৯৪৫-১৪৮২) কাজেই সুন্নত হলো, জানাযার সামনে হাঁটা। তবে

বাহনের যাত্রী পিছনে যাবে এবং পদব্রজের যাত্রী সামনে যাবে। পদব্রজের যাত্রীও যদি পিছনে হাঁটে তাতেও কোন দোষ নেই। উম্মে আ'ত্বীয়্যা বলেন,

((نُهِيْنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا))

অর্থাৎ, "আমাদেরকে (মহিলাদেরকে) জানাযার পিছনে যেতে নিষেধ করা হয়েছে তবে এ ব্যাপারে আমাদের উপর কড়াকড়ি ও শক্তভাবে নিষেধ করা হয় নি।" (বুখারী ৩১৩-মুসলিম ৯৩৮) অতএব মহিলাদের জানাযার পিছনে যেতে নিষেধ করা ওয়াজিব। কারণ, মহিলারা দুর্বল, অধৈর্য হয়ে পড়বে। ফিতনায় পতিতা হতে পারে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টির প্রকাশ করতে পারে। তাই মহিলাদের জন্য জায়েয নয় যে, সে কোন জানাযায় শরীক হবে এবং কবর যিয়ারত করতে যাবে, যদিও সে কোন বৃদ্ধা মহিলা হয়। বর্তমানে শরীয়ত পরিপন্থী কিছু বাঁধা নিয়ম চালু হয়েছে যে সম্পর্কে আলেমগণ লেখালেখী করছেন, উহার ভুল হওয়ার কথা তুলে ধরছেন এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করছেন। আর সঠিক তরীকা কি সেদিকে ইঙ্গীতও করছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন! আর বাঁধা নিয়মগুলো হলো,

*তাঁবু লাগিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করণের মাধ্যমে শোকসভার আয়োজন করা। সেখানে কান্নাকাটি ও রোদন ক'রে এবং মুখে চপেটাঘাত ও বুকের কাপড় ছিঁড়ে শোক পালন করা। অনুরূপ (আল্লাহ কর্তৃক) নির্ধারিত ফায়সালার প্রতি অধৈর্যের প্রকাশ করা।

*অনেকের সমবেদনা প্রকাশের সময় হাসি-ঠাট্টা করা অথবা এমনভাবে হাসা যে, উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় কিংবা পার্থিব বিষয়ে সুদীর্ঘ অনর্থক আলোচনা করাও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের আওতাভুক্ত। এ ছাড়া আরো অনেক কার্যকলাপ রয়েছে যা শরীয়ত পরিপন্থী এবং যে ব্যাপারে আলেমগণ বলছেন ও সতর্ক করছেন।

এই হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কর্তৃক আনীত ভালবাসার কতিপয় সেতুসমূহ। এরই উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁর সাহাবীগণ-আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন!-এবং তাঁরা এর বাস্তব রূপ দানও করেছিলেন। আর সব দিক দিয়ে এই গুণগুলো গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন অনুপম আদর্শ। এঁরাই ছিলেন সেই লোক যাঁদের সমগ্র অন্তর এই নৈতিকতায় পরিপূর্ণ ছিলো। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার ফল ফলিত হয়। এই (নৈতিকতার) কারণে তাঁরা এমন শীর্ষে গিয়ে পৌছেন যেখানে পৌছা কেবল তারই পক্ষে সম্ভব হয়, যে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে, কিতাব এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে এবং ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান হয়।

হৃদয় আকৃষ্ট করার কৌশল

প্রথমতঃ উন্নত নমুনা যার উপর লালিত হয়েছেন সাহাবীগণঃ

আমরা (পারস্পরিক) অন্তরসমূহ আকৃষ্ট করার কৌশল গ্রহণ করবো সহীহ সূত্রে বর্ণিত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর জীবনী এবং তাঁর রেখে যাওয়া শিক্ষা ও তাঁর দাওয়াত থেকে। আমরা পরস্পর উহার অনুশীলন করবো, শিখবো এবং উহারই

হবে কেউ কারো থেকে পালাবে না? তিনি বললেন, জান্নাতবাসীরা একে অপরের মুখোমুখী হয়ে পরস্পর লজ্জিত হয়েছিলেন। যখন ত্বালহা যুদ্ধে মারা যান,-তিনি ছিলেন আলী (রাঃ)র বিরোধী দলের সাথে- তখন আলী (রাঃ) তাঁর ঘোড়া থেকে অবতরণ ক'রে তরবারী ছুড়ে ফেলে দিয়ে ধীর পদে ত্বালহার দিকে অগ্রসর হোন এবং তাঁর দিকে তাকান তিনি তখন হত্যাকৃত। আর ত্বালহা ছিলেন সেই দশজনের একজন, যাঁরা সবাই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত। তিনি (আলী রাঃ) ত্বালহার দাড়ি থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! তোমাকে এই অবস্থায় দেখে আমি চরম দুঃখিত ও বড়ই কষ্টবোধ করছি। তবে আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যেন তিনি আমাকে ও তোমাকে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের ব্যাপারে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾. [الحجر:٤٧].

অর্থাৎ, "তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা ছিলো, আমি তা দূর করে দেবো। তারা ভাই ভাইয়ের মত সন্তুষ্টির সাথে সামনা-সামনি আসনে বসবে।" (১৫ঃ ৪৭) লক্ষ্য করুন এমনি পরিষ্কার, নির্মল এবং গভীর অন্তর ও অপূর্ব দৃশ্যের প্রতি। তাঁরা একে অপরের সাথে খুনোখুনীতে লিপ্ত। রক্তাক্ত ময়দান। অথচ আলী (রাঃ) ত্বালহা (রাঃ)কে জড়িয়ে ধরে সালাম করছেন এবং স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর সাথে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে থাকবেন। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে। সত্যিই তা এক কল্পনাতীত অদ্ভূত দৃশ্য এবং জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দেদীপ্যমান এই দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য পরিষ্কারভাবে প্রমাণ

করে যে, ঐ (সাহাবীগণ) মানুষগুলো মানবসুলভ দোষ-গুণের বাইরে ছিলেন না এবং কোন দিন ফেরেশতাও হয়ে যান নি। তবে তাঁরা ছিলেন মানবতার অতীব চমৎকার নমুনা যাঁদেরকে দুনিয়া চিনেছে। ইবনুস্‌সাম্মাকের পাশ দিয়ে তাঁর একজন সাথী যাওয়াকালীন তাঁকে তিরস্কার ক'রে বললেন, আগামী কাল আমরা একে অপরের হিসাব নেবো। অর্থাৎ, কাল আমরা পরস্পর মিলিত হয়ে আমি তোমার হিসাব নেবো আর তুমি আমার হিসাব নেবে। আমি তোমাকে তিরস্কার করবো আর তুমি আমাকে তিরস্কার করবে এবং জানবো আমাদের মধ্যে কে ভুলের উপর রয়েছে। তখন ইবনুস্‌সাম্মাক বললেন, না, আল্লাহর শপথ! বরং আমরা পরস্পরকে ক্ষমা করবো। অতএব মু'মিনরা একে অপরের হিসাব নেয় না এবং একজন অপরজনকে বলে না যে, তুমি আমার সম্পর্কে এ রকম লিখেছো অথবা এ রকম বলেছো কিংবা আমি শুনেছি যে, তুমি আমার গীবত করেছো ইত্যাদি---। এটা ভুল পদ্ধতি। সঠিক হলো, তাকে বলবে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন!

৩। **সম্ভ্রম ও সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় পেশ করাঃ**

পবিত্র এই মানবগোষ্ঠী এত দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন যে, আবূ যামযাম নামের তাঁদের একজন রাতে উঠে নামায আদায় ক'রে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে দুআয় মগ্ন হয়ে বলেন, হে আল্লাহ! আমার কোন সম্পদ নেই যে, তা আমি তোমার রাস্তায় সাদক্বা করবো এবং দৈহিক শক্তিও নেই যে, তা দিয়ে তোমার পথে জেহাদ করবো। তবে আমি আমার সম্ভ্রমকে মুসলিমদের জন্য সাদক্বা করছি। কাজেই হে আল্লাহ! যে আমাকে গাল-মন্দ করেছে অথবা আমার

ও একক, মুখাপেক্ষীহীন, যিনি কাউকে জন্ম দেন নি, কারো থেকে জন্মও নেননি এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই, তিনি মানুষ কর্তৃক গালমন্দ শুনেন! দুর্বল এই সৃষ্টি, তুচ্ছ, শুক্র থেকে নির্গত কীট হয়ে গৌরবময় মহান আল্লাহকে গালি-গালাজ করে?! বুখারী(৪৯৭৪) শরীফে আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন,

((كَذَّبَنِيْ ابنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ، وَشَتَمَنِيْ وَلَمْ يَكُن لَهُ ذٰلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيْدَنِيْ كَمَا بَدَأَنِيْ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا))

অর্থাৎ, "আদম সন্তান আমাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে, অথচ এটা করা তার উচিত নয়। আর আমাকে গালমন্দ করে, অথচ এটা করা তার উচিত নয়। আমাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হলো, তার এই বলা যে, আমাকে আল্লাহ যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, সেভাবে আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না। আর আমাকে গালি দেওয়া হলো, তার এই বলা যে, আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন।" আর ইমাম আহমদ 'কিতাবুয্যূহদ'এ উল্লেখ করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, "হে আদম সন্তান, তোমার ব্যাপার বড়ই বিস্ময়কর। আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। আর তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করো। আমি তোমাকে রুজি দেই। আর তুমি অন্যের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। তোমার প্রতি অনুগ্রহ ক'রে আমি তোমাকে ভালবাসি। আর আমি তোমার মুখাপেক্ষীও নই। আর তুমি অবাধ্যতা ক'রে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো। অথচ তুমি আমার মুখাপেক্ষী। আমার কল্যাণ

তোমার উপর নাযিল হয়। আর তোমার অকল্যাণ আমার দিকে উঠে আসে।" তাই যখন এক ও একক পূত-পবিত্র মহান আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির কিছু দুষ্ট লোক গাল-মন্দ করতে পারে, তখন আমাদেরকে তো করতেই পারে। আমরা তো ভুলের উর্ধ্বে নই।

এই অবগতিই হলো সেই উন্নত নমুনার উত্তম প্রমাণ, যা পেশ করেছেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাহাবাগণ। (রাযীআল্লাহু আনহুম/ আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন!) তাঁরা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্টিও থাকতেন আবার পারস্পরিক বিরোধিতাও করতেন যেমন মানুষ বিরোধিতা করে থাকে। তাঁদের জীবনে এমনও কিছু দিন অতিবাহিত হয়েছে যে, তাঁরা পরস্পরকে ঘৃণা করেছেন। কিন্তু তা হতো সাময়িকের জন্য। পুনরায় তাঁরা (পারস্পরিক ঘৃণা) দূর করে দিয়ে পরিষ্কার মনে একে অপরের সাথে মিলে গিয়ে সহিষ্ণুতা ও প্রেম-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, তাঁরা যে মৌলিক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তা ছিলো একটাই, একাধিক নয়। আর তাঁদের সেই মৌলিক বিষয় ছিলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ'। আর তাঁদের মধ্যে যা ঘটেছিলো, তার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা মানবসুলভ দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না। তাঁরা ফেরেশতাও ছিলেন না এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর এই সাধারণ উক্তি "প্রত্যেক আদম সন্তান দ্বারা ভুল হয়"-এর বাইরে ছিলেন না। আর তাঁরা কোন দাগ ও দোষহীন সাদা কাগজের মত দোষ-ত্রুটিমুক্ত ছিলেন না। তাঁরা মানুষ ছিলেন। তাঁদের অন্তরে মানব প্রবর্তনা ও প্রেরণা কর্মরত ছিলো। আর এই মানব প্রবর্তনা নিয়ে তাঁরা আল্লাহর যমীনে চলা-ফেরা করতেন। তবে তাঁদের

গেলো। কেননা, যে বিবাদ দূর ক'রে মীমাংসার পথ সুগম করতে পারে এবং মানুষের প্রতি কোন আঘাত হানে না-বিশেষ করে মর্যাদাসম্পূর্ণ ও উচ্চ বৈশিষ্ট্যসম্পূর্ণ ব্যক্তিদের প্রতি-, সে স্বীয় নাফ্সের এবং ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি অনুগ্রহশীল বিবেচিত হয়।

৬। আত্মসমালোচনা করাঃ

সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার-(রাযীআল্লাহু আনহুম/ আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন!-এর জীবনীতে উল্লিখিত যে, মিনার মাঠে এক ব্যক্তির সাথে তাঁর ঠেলাঠেলি হয়ে গেলো। সালিম তাবেয়ীনদের একজন পন্ডিত মানুষ ছিলেন। লোকটি সালিম (রাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে বললো, আমি মনে করি আপনি একজন মন্দ লোক। সালিম (রাঃ) তখন বললেন, আমাকে তুমি ছাড়া আর কেউ চিনতে পারে নি। কেননা, সালিম (রাঃ) নিজের মধ্যে অনুভব করছিলেন যে, তিনি একজন খারাপ লোক। আর এটাই ঠিক। কারণ, মু'মিন সব সময় নিজেকে কম ভাবে বা নিজের মধ্যে ভুল-ত্রুটি অনুভর করে যখন দেখে যে, তার নাফ্স অহংকার অথবা গর্ব করছে বা নিজেকে ভুলে যাচ্ছে। অনুরূপ সে নাফ্সকে তিরস্কার করে এবং উহার পর্যবেক্ষণ করে। পক্ষান্তরে দুষ্ট ও মুনাফেক্বরা মানুষের সামনে নিজের প্রশংসা করে। সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব মধ্য রাতে উঠে স্বীয় নাফ্সকে বলতেন, হে যাবতীয় অসৎকর্মের কেন্দ্র উঠ!

বিশুদ্ধ সূত্রে এ ঘটনাও প্রমাণিত যে, এক ব্যক্তি হারাম শরীফে উম্মতের একজন বিজ্ঞ-পন্ডিত এবং কুরআনের ভাষ্যকার ইবনে

আব্বাস (রাঃ)র সামনে দাঁড়িয়ে লোক মাঝে তাঁকে গালমন্দ করতে লাগলো। তিনি কেবল স্বীয় মাথা ঝুঁকালেন। কঠোর স্বভাবের অধিকারী একজন গ্রাম্য লোক দুনিয়ার একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছে অথচ তিনি কোন উত্তর করছেন না। গ্রাম্য লোকটি অব্যাহতভাবে গালি দিতেই থাকলে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বীয় মাথা তুলে বললেন, তুমি আমাকে গালি দাও, অথচ আমার মধ্যে তিনটি (ভাল) স্বভাব বিদ্যমান। লোকটি বললো, হে ইবনে আব্বাস! কি সেই স্বভাবগুলো? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! কোন যমীনে বৃষ্টি হলে আমি এর জন্য বড়ই আনন্দিত হয়েছি এবং আল্লাহর প্রশংসা করেছি, অথচ সেখানে আমার কোন উট বা ছাগল নেই। লোকটি বললো, দ্বিতীয়টি কি? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, যখন কোন ন্যায়পরায়ণ বিচারকের কথা শুনেছি, তখনই তার অনুপস্থিতিতে তার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছি, অথচ তার কাছে আমার কোন মামলা-মকদ্দমা নেই। লোকটি বললো, তৃতীয়টি কি? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতের যখন (সঠিক) অর্থ আমি বুঝে নিই, তখন এই আশা করি যে, সকল মুসলিমরাও যেন ঐভাবেই বুঝে নেয় যেভাবে আমি বুঝেছি।

এই হলো উন্নত নমুনা যা পেশ করেছেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ। তিনি তাঁদেরকে আক্বীদার ভিত্তিসমূহ ও ঈমানী নৈতিকতার উপর লালন-পালন করেছেন। তা নাহলে তাঁরা তো মরুভূমি থেকে আবির্ভূত এক নিরক্ষর জাতি ছিলেন। তিনিই তাঁদেরকে ক্রমে ক্রমে তৈরী করেছিলেন। তাঁদের গৌরবকে চমৎকৃত করেছিলেন এবং তাঁদেরকে গুরুত্বসহকারে লালন করেছিলেন। ফলে

এত বেশী যে তা দু'কুল্লা পানির মত তাতে কোন কিছু পড়লে তা প্রতিক্রিয়াশীল হয় না। এদের উপর কোন সময় শয়তানের প্ররোচনা এলেও তা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ জন্য ইবনে তাইমিয়্যা (রাহঃ)-এর উক্তি হলো,-তাঁর এই উক্তি ইবনুল কাইয়্যেম স্বীয় 'মাদারিজুল সালেকীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-মূসা (আঃ) তক্তী/ফলক নিয়ে এসেছিলেন। তাতে ছিলো আল্লাহর কালাম। সেগুলো ফেলে দিয়ে তিনি নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। ইবনে তাইমিয়্যা (রাহঃ) বলছেন, তাঁর ভাইও তাঁর মত নবী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর দাড়ি ধরে মানুষের সামনে টান দেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

((أَقِيْلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِم))

অর্থাৎ, "প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও।" (আবূ দাউদ ও আহমদ, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৪৩৭৫) ইবনুল কাইয়্যেম বলছেন, তবে দন্ডবিধি(ক্ষমা হয় না)। কারণ, দন্ডবিধির ব্যাপারে মানুষ সবাই সমান। হ্যাঁ, যেসব বিষয়ে দন্ডবিধি নেই, সে ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য হলো, প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী ব্যক্তিদের অপরাধ মার্জনা করা। আর প্রশংসানীয় গুণের অধিকারী ব্যক্তি হলেন তাঁরা, যাদের ইসলামে, দাওয়াতী কাজে, কল্যাণ, উদারতা, নেতৃত্ব দান এবং সুপথ নির্দেশনা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির ব্যাপারে উচ্চ স্থান রয়েছে। এঁরা হলেন মানুষের মধ্যে মর্যাদাসম্পন্ন এবং প্রভূত কল্যাণ ও অনুগ্রহকারী ব্যক্তি বিশেষ। এই ধরনের লোকের দ্বারাই রাগের মাথায় কোন (অপ্রীতিকর) কথা

বেরিয়ে যায়, তবে আমাদের সকলের উচিত তা সহ্য করা এবং তাঁদের নেকী ও অনুগ্রহের খাতার দিকে লক্ষ্য করা। অনুরূপ আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে তাঁদের কত মর্যাদা সেদিকেও খেয়াল করা।

আপনার ভাইয়ের সাথী হয়ে তার পদস্খলন সহ্য করুন! তার অপরাধ ও ভুল-ত্রুটি মার্জনা করুন! ইবনে মুবারক (রাহঃ) তাঁর সাথীদের কোন কথা এলে বলতেন, ওর মত কে হতে পারে? ওর মধ্যে এই এই সুন্দর গুণ রয়েছে। আর মন্দ জিনিসগুলোর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতেন। আমরা যদি মানুষের পুণ্যের খোঁজ করি, তাহলে আমার জানা মতে এমন কোন মুসলিম পাওয়া যাবে না যে, সে যতই ভুল-ত্রুটিকারী হোক তবুও তার কিছু নেকী থাকবে। তার যদি কিছুই নেকী না থাকে কেবল সে যদি নামায আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে, তবে তা-ই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

*রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর কাছে এক মদপানকারীকে আনা হলে তিনি তাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দেন। ইতিপূর্বে কয়েকবার তাকে আনা হয়েছিলো। তাই এক ব্যক্তি বললো, ওর প্রতি আল্লাহর লা'নত! কতবারই না আনা হলো ওকে। তখন মহান শিক্ষক রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন,

((لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ))

অর্থাৎ, "ওকে লা'নত করো না। আল্লাহর শপথ! সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।" (বুখারী ৬৭৮০) অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি বললো, ওর কি হয়েছে, আল্লাহ ওকে লাঞ্ছিত করুন! তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾. [آل عمران:١٠٣].

অর্থাৎ, "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছো। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনিই তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন।" (আল-ইমরানঃ ১০৩)

*ঐতিহাসিকগণ সহীহ সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, সাহাবাগণ বানী মুস্তালাক্বের যুদ্ধে বের হোন। উমার (রাঃ)-এর জাহজাহ নামক এক মুক্তকৃত ক্রীতদাস ছিলো। তার সিনান ইবনে ওবরা নামক একজন আনসারী সাহাবীর সাথে ঝগড়া বেধে যায়। আনসারী সাহাবী চরমভাবে রাগান্বিত হোন। এমন কি উভয়ে ডাক পাড়তে শুরু করে। উমার (রাঃ)-এর মুক্তকৃত ক্রীতদাস হে মুহাজিরগণ! বলে ডাক পাড়ে। আর আনসরী সাহাবী হে আনসারী সাহাবাগণ! বলে ডাক পাড়ে। ফলে অন্তরসমূহ বেদনাযুক্ত ও পীড়িত হয়ে পড়ে। লোকেরা মুনাফেক্বদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবায় ইবনে সুলুলকেও এ খবর দেয়। সে শুনে বলে উঠলো, কথায় বলে, কুকুরকে ক্ষুধার্ত রাখো, তাহলে সে তোমার অনুসরণ করবে। তাকে

মোটা করলে, সে তোমাকেই কামড়াবে! আমরা যদি ওদেরকে আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতাম, তাহলে ওরা এ রকম করতো না। আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানিত ব্যক্তিরা হীনদেরকে অবশ্যই বহিষ্কার করবে। তার এ কথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছে যায়। যায়েদ ইবনে আরক্বাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে এ খবর দেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সাহাবীদেরকে সেখান থেকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। যাতে মুনাফেক্বরা এ ব্যাপারে কিছু বলাবলি করার সুযোগ না পায়। মুনাফেক্ব প্রকৃতির লোকরা উড়ো খবরকে খুব ভালবাসে। সমাজে কিছু মানুষ এমনও আছে যাদের কাজ হলো, (ভিত্তিহীন) খবর রটানো এবং (মানুষের) দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধান করা। এমন কি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ক'রে বই-পুস্তক পর্যন্ত লিখে ফেলে। এ কাজেই তারা ব্যস্ত থাকে এবং (মানুষের) সম্ভ্রম নিয়ে ঐভাবেই চাটে (খোঁটা দেয়), যেভাবে কুকুর জিভ দিয়ে পানি চাটে।

লক্ষ্য করুন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর সুবিজ্ঞ পদক্ষেপের প্রতি, তিনি সাহাবীদেরকে সেখান থেকে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। যাতে করে তারা এ ব্যাপারে বলাবলি করার এবং এতে ব্যস্ত হওয়ার সুযোগ না পায়। তাই উড়ো খবরকে বাতিল সাব্যস্ত করার এবং সাথীদের আপোসের বিরোধ দূরীকরণের মোক্ষম উপায় হলো, লোকদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে এবং জ্ঞানসংক্রান্ত বিষয়সমূহে ব্যস্ত রাখুন। তাদের সামনে মুসলিম জাতির বৃহত্তম সমস্যার কথা তুলে ধরুন। কেননা, মুসলিম জাতির ও ইসলামের

পায়, যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে অবাক করে দেয় এবং বিজ্ঞ ও পন্ডিতগণ তার ব্যাখ্যা দিতে অপারগ হন।

এই (আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়) হতভাগা মারা গেলে, তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁর জামা চাইলেন যাতে তাঁর পিতাকে দাফন করবেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁকে তা দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে তার জানাযার নামায পড়াতে বললেন। তিনি তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য দাঁড়ালে উমার (রাঃ) রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর কাপড় ধরে টান দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ওর নামায পড়াবেন অথচ আপনার প্রতিপালক ওর নামায পড়াতে নিষেধ করেছেন? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, আমাকে আল্লাহ ইখতিয়ার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾ .{التوبة:٨٠}

অর্থাৎ, "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করো, তথাপি আল্লাহ কখনোই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।" (সূরা তাওবাঃ ৮০) আর আমি সত্তরেরও বেশী করবো। উমার (রাঃ) বললেন, সে তো মুনাফেক্ব। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ওর জানাযার নামায পড়ালেন এবং মুসলিমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। ফলে আল্লাহ এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ ক'রে বললেন,

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ .{التوبة:٨٤}

অর্থাৎ, "আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনোও নামায পড়বেন না এবং তাঁর কবরে দাঁড়াবেন না।" (সূরা তাওবাঃ ৮৪)

* এমন মুনাফেক্বের দল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট আসতো, যারা অন্যায় করেছিলো, যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে পিছনে রয়ে গেছিলো এবং রাসূলের নির্দেশের ও আল্লাহর অবাধ্যতা করে ছিলো। এসে কেউ বলতো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অসুস্থ ছিলাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলতেন, তুমি সত্যই বলেছো। অথচ সে শারীরিক ব্যধিগ্রস্ত হতো না, বরং তার অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত হতো। দ্বিতীয়জন এসে বলতো, যুদ্ধের সময় আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। তাকেও তিনি বললেতন, তুমি সত্যই বলেছো। তৃতীয়জন এসে বলতো, আমি নিঃস্ব, উট কিনতে পারি নি। একেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলতেন, তুমি ঠিকই বলেছো। এই কথাটাই মহান আল্লাহ কুরাআনে তুলে ধরে বলছেন,

﴿عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾التوبة:٤٣]

অর্থাৎ, "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেতো সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের।" (সূরা

সিক্ত করে ফেললেন। তারপর দামেশকে মুআবিয়া (রাঃ)র নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর মাথা চুম্বন ক'রে বললেন, আল্লাহ যেন আপনার ঐ প্রজ্ঞাকে নষ্ট না করেন, যে প্রজ্ঞা কুরাইশদের মধ্য থেকে আপনাকে এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তৃতীয়তঃ ইসলামী পতাকা তলে একত্রিত হওয়াঃ

অন্যান্য জাতিদের থেকে আমরা ভিন্ন। আমরা দেশ প্রেমের ভিত্তিতে একত্রিত হই না। জাতীয়তা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে নি। কারণ, প্রত্যেক মুসলিম দেশই আমাদের দেশ। যে দেশেই আল্লাহর নাম উচ্চারিত হবে, সে দেশই হবে প্রত্যেক মুসলিমের দেশ। অনুরূপ রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতেও আমরা একত্রিত হই নি। কারণ, রক্ত সম্পর্কীয় আহ্বান, যমীনের আহ্বান যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে নাযিল করেন নি। অনুরূপ ভাষার ভিত্তিতেও আমরা একত্রিত হই নি। কেননা, ভাষা অনেক প্রকারের। হ্যাঁ আমরা একত্রিত হয়েছি আক্বীদার ভিত্তিতে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কর্তৃক আনীত মৌলিক বিষয়ের ভিত্তিতে। আর তা হলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ'। এই মহান মৌলিক বিষয়ের ভিত্তিতেই আমাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়েছে এবং বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্যের পর আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। যখনই (আমাদের পারস্পরিক) দূরত্ব অথবা বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, তখনই আমরা দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করি এবং স্মরণ করি যে, আমরা পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ি। একই ক্বিবলার দিকে মুখ করি। একই রাসূলের অনুসরণ করি। একই আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের সাথে রয়েছে একই কিতাব (কুরআন) ও একই সুন্নত। অতএব যাবতীয়

প্রশংসা আল্লাহরই। মাঝে মধ্যে সাথী-সঙ্গীদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দেয়, তা তাদের প্রেম-প্রীতি নষ্ট করে না এবং আন্তরিকতার কোন পরিবর্তনও সূচিত হয় না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

অর্থাৎ, "যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করতো না। অতএব আপনি তাদেরকে এবং মিথ্যাবাদকে মুক্ত ছেড়ে দিন" (সূরা আন্‌আমঃ ১১২) অর্থাৎ, এই ধরনের (বিরোধ ইত্যাদি) যা সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। এতেও হয়তো মহা কল্যাণ নিহিত আছে যা আল্লাহই ভাল জানেন। হতে পারে কোন জিনিস আমাদের কাছে পছন্দসই নয়, অথচ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত থাকে। আবার কোন জিনিসকে আমরা পছন্দ করি, অথচ তার মধ্যে অনেক অকল্যাণ নিহিত থাকে। পরিপূর্ণ কৌশলের অধিকারী তো একমাত্র আল্লাহ। কাজেই আল্লাহর কোন কার্যকলাপকে অপছন্দ করবেন না। ভাল-মন্দের মালিক তিনিই। কখনো কখনো এমন অনেক বিষয় সংঘটিত হয়, যার মধ্যে থাকে প্রভূত কল্যাণ যা মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে না। আর এই বিষয়গুলোর মধ্যে কোন কোন বিষয় মানুষের শক্তি ও তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। তার হেফাযত করে ও তার (গুনাহের) জন্য কাফ্‌ফারা হয়। অথচ সে হয়তো মনে করে যে, এটা তার জন্য শাস্তি, মার এবং ছোট কোন মুসীবত। আল্লাহই একমাত্র পরিপূর্ণ কৌশলের অধিকারী। তাই প্রত্যেক বান্দার উচিত সকাল ও সন্ধ্যায় বলা,